যোগিরাজাধিরাজ

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

বিশুদ্ধবাণী

প্রথম ভাগ

শ্রীগুরু-স্মরণ

রায় সাহেব শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, কবিরত্ন, এম-এ

(১)

দেব দয়াময় দীন-শরণ্য
দৈবত দুর্ল্লভ-ভূতি বরেণ্য।
গন্ধ বিমোহিত সজ্জন চিত্ত
সর্ব্বজনৈরভিনন্দিত বৃত্ত ॥

হে দেব, হে দয়াময়, হে দীনের আশ্রয়, দেবদুর্লভ বিভূতির জন্য আপনি বরেণ্য। আপনার গাত্রগন্ধ সকল সজ্জনকে বিমোহিত করিত এবং সকল লোক আপনার স্বভাবের অভিনন্দন করিত।

(২)

শক্তিসনাথ-মহেশ্বর লীল
সঙ্কট-কণ্টক-মোচনশীল।
কেলি-কলা-কুতুকৈঃ কৃতস্বষ্টে
স্নেহ-বিমোচন-লোচন দৃষ্টে ॥

আপনার লীলা হইতেছে (মন্ত্রমহেশ্বর) শক্তি-সনাথ শিবেরই লীলা। কণ্টকরূপ সঙ্কট হইতে মোচন আপনার স্বভাব।

আপনি যেন খেলিতে খেলিতেই (অর্থাৎ বিনা আয়াসে) নানা দ্রব্য সৃষ্টি করিতেন এবং আপনার নয়নযুগল শিষ্যগণের প্রতি স্নেহ বর্ষণ করিত।

(৩)

বিপ্লবহীন-বিবোধ-সুবৃদ্ধ
শৈশব-সঙ্গত-কৌতুকসিদ্ধ।
রাজস-তামসবৃত্তি-বিমুক্ত
মঙ্গলমণ্ডিত-কর্ম্মণি যুক্ত॥

আপনি বিচ্ছেদহীন প্রজ্ঞানে সুবৃদ্ধ ছিলেন, (তথাপি শিশুদিগের সঙ্গে) শৈশবোচিত কৌতুকেও পটু ছিলেন। রজোগুণের বা তমোগুণের কোনও বৃত্তি আপনাতে দেখা যায় নাই; আপনি মঙ্গলমণ্ডিত (সাত্ত্বিক) কর্ম্মেই নিযুক্ত থাকিতেন।

(৪)

জ্ঞানসমুজ্জ্বল ভক্তিসমৃদ্ধ
যোগবিকাশিত-শক্তিভিরিদ্ধ।
ব্রহ্মপদে পরমে সুনিষণ্ণ
নিত্য-সমাধি-পদং প্রতিপন্ন॥

আপনি জ্ঞানসমুজ্জ্বল ভক্তিতে সমৃদ্ধ এবং যোগ বিকাশিত শক্তিসমূহ দ্বারা দীপ্ত ছিলেন। আপনি পরমব্রহ্মপদে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং অখণ্ড সমাধি (চৈতন্য সমাধি) সম্পন্ন ছিলেন।

(৫)

সংযমদীপ্তচরিত্র-মহিষ্ঠ
শৌচ-সদাচরণাস্থিতনিষ্ঠ।
ধ্যানধনিষ্ঠ-সুকীর্ত্তিগরিষ্ঠ
সুব্রত সুক্রিয় যোগিবরিষ্ঠ॥

আপনার চরিত্র সংযমে দীপ্ত ছিল বলিয়া আপনি অতি মহান্, শুচিতা ও সদাচার নিষ্ঠাযুক্ত, ধ্যানধনে অতিমাত্র ধনী, সুকীর্ত্তিতে গরিষ্ঠ, সুব্রত, সৎক্রিয়াবান্ এবং যোগিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

(৬)

সদ্‌গুরু-গৌরব-শুভ্র-যশস্ক
শিষ্যহিতে সততং সমনস্ক।
যোগকলা-কলিত-গ্রহ-ভোগ
ভোগ-পরিগ্রহ-দূরিত-রোগ॥

আপনার যশঃ সদ্‌গুরুর প্রাপ্য গৌরবে শুভ্র, (কেননা) আপনি শিষ্যগণের হিতে সর্ব্বদা মনোযোগী। যোগকলা (যোগ-জ্যোতিষ) দ্বারা আপনি তাহাদের গ্রহের ভোগ নির্ণয় করিয়া দিতেন এবং তাহাদের রোগের ভোগ স্বয়ং আকর্ষণ করিয়া নিয়া তাহাদিগকে নিরাময় করিতেন।

(৭)

মূর্দ্ধনি সংধৃত-শৈল-হরীশ
বক্ত্রবিলে কৃত-বিশ্ব-বিকাশ।
হিংসিত-বিষ্কির-জীবন-দান-
লব্ধ-বিদেশি-সুধীজন-মান॥

আপনি মস্তকাভ্যন্তরে শিলাময় বিষ্ণু ও শিবকে (শালগ্রাম ও বাণলিঙ্গ) রাখিয়া দিয়াছিলেন এবং নিজ মুখবিবরে (ম, ম, সদাশিব মিশ্রকে) বিশ্বদর্শন করাইয়াছিলেন। একটি নিহত (চটক) পক্ষীকে জীবন দান করিয়া বিদেশীয় সুধীজন (Paul Brunton) হইতে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(৮)

নাভি-বিলোত্থ-সনাল-সরোজ-
দর্শন-বিস্মিত-শিষ্য-সমাজ।
ব্যক্ত-দিবাকর-সংশ্রয়-বিত্ত
গর্ব্ববিনাকৃত-মত্যনবত্ত॥

আপনার নাভিরন্ধ্র হইতে উত্থিত (অপূর্ব্ব) সনাল পদ্ম দর্শন করিয়া শিষ্যগণ বিস্মিত হইয়াছিল। আপনি (তৎপূর্ব্বে অজ্ঞাত) সূর্য্যবিজ্ঞান প্রকাশ করেন। (এত শক্তি সত্ত্বেও) আপনি নিরভিমান ছিলেন বলিয়া আপনি কাহারও নিন্দাভাজন হন নাই।

(৯)

মাং স্মরসীহ নু শিষ্যমধন্যং
তুচ্ছতমং গুণবৎসু ন গণ্যম্।
দুর্ভর-দুষ্কৃতভার-নিপিষ্টং
দোষসমূহহতং হতদিষ্টম্॥

(হে গুরুদেব,) আপনার এই সুকৃতহীন শিষ্য আপনার স্মরণে আছে কি ? (না থাকিবার সম্ভাবনা এই যে) আমি যে অতি তুচ্ছ ব্যক্তি—গুণবান্ শিষ্যদিগের মধ্যে গণ্য নহি। (পূর্ব্বজন্মের)

দুর্ভর পাপভারে নিপিষ্ট আমি (এ জন্মেও) বহু দোষে হত (দুষ্ট), সুতরাং দুর্ভাগ্য।

(১০)

প্রাপ্তকৃপোঽপি ন জাগরমাপ্ত-
স্তামসবৃত্তিবশোঽস্মি সুষুপ্তঃ।
তারয় মাং ভবতারণ তূর্ণং
গৌরবমস্তু তবাত্র চ পূর্ণম্॥

আমি (সদ্‌গুরুর—আপনার) কৃপা প্রাপ্ত হইলেও এখনও জাগি নাই—তামসিক বৃত্তির অধীন হইয়া গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্নই আছি। হে ভবতারণ, শীঘ্র আমাকে ত্রাণ করুন এবং তদ্দ্বারা এক্ষেত্রেও আপনার গৌরব পূর্ণ হউক।

সূচনা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট

পরমারাধ্যপাদ গুরুদেব শ্রীশ্রীমদ্ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের পুণ্য স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য ৺কাশীধাম হইতে "বিশুদ্ধবাণী" নামে একখানা গ্রন্থ নিয়মিতভাবে ধারাবাহিক প্রকাশিত করিবার সঙ্কল্প অনেক দিন হইতেই জাগিয়াছিল। কিন্তু নানা অন্তরায়বশতঃ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ইহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। আজ শ্রীগুরুদেবের আশীর্ব্বাদে আমাদের সম্মিলিত সৌভাগ্যের উদয়ে সেই শুভ সঙ্কল্প মূর্ত্তরূপ ধারণ করিয়াছে। তাই এই মঙ্গলময় মুহূর্ত্তে আমরা শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া আমাদের সমুদয় ভ্রাতৃবৃন্দকে সাদরে অভিনন্দন করিতেছি।

'বিশুদ্ধবাণী' বিশুদ্ধ স্মৃতিকে উজ্জ্বল করিয়া ধারণ করিবে ও যথাশক্তি বহন করিবে। যে বিশুদ্ধসত্তা আমাদের জীবনের কর্ণধাররূপে—ভবপারের কাণ্ডারীরূপে—সমাগত, আমরা জানি সেই বিশুদ্ধসত্তাই সমগ্র বিশ্বের একমাত্র কর্ণধার—"মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্ গুরুঃ", যিনি আমাদের গুরু তিনিই বিশ্বগুরু, যিনি বিশ্ব-গুরু তিনিই আমাদের গুরু। সুতরাং বিশুদ্ধ-স্মৃতি বলিতে আমরা শুধু ব্যক্তিগতভাবে আমাদের গুরুদেবের অধ্যাত্মজীবন সাধন ও সিদ্ধির ইতিহাস, তদুপদিষ্ট তত্ত্ব ও ক্রমনির্দ্দেশ, দেশ ও কাল-বিশেষে তৎপ্রদর্শিত লীলাবিভূতি প্রভৃতির স্মরণ ও আলোচনা

বুঝিব না, কিন্তু সর্ব্বযুগের ও সর্ব্বদেশের ভগবদ্‌ভক্ত, তত্ত্বজ্ঞানী ও কর্ম্মনিষ্ঠ যোগিজনের সাধন, সিদ্ধি ও উপদেশও গ্রহণ করিব। কারণ সর্ব্বত্রই এক বিশুদ্ধ সত্তার খেলাই রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, মহাজনগণের অনুমোদিত অনুভবসিদ্ধ ও স্বসংবেদ্য মার্গ বা উপায়ের আলোচনাও আমাদের লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত মনে করিব। মোটকথা, যে কোন আলোচনা মানব মাত্রের হিতকর ও লক্ষ্য-প্রাপ্তির অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহার মধ্যে কোনটির প্রতিই বিশুদ্ধবাণী সমুচিত সমাদর প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠা বোধ করিবে না। চিত্তের অনুদার ভাব হইতেই নিজের অপরিগৃহীত বা অপরিচিত মত ও পথের প্রতি মানুষের অশ্রদ্ধার উদয় হয়। এই সঙ্কোচময়ী দৃষ্টি বিশুদ্ধবাণীর মৌলিক আদর্শের প্রতিকূল। যেখানে সর্ব্বত্র আত্মভাবের প্রসার অভিপ্রেত সেখানে দ্বন্দ্ব ও বিরোধের অবসর কোথায়? জগতে বিরোধ আছে ইহা সত্য—বিচারক্ষেত্র, দর্শনশাস্ত্র ও ব্যবহারভূমি সর্ব্বত্রই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বিরোধের মধ্যে অবিরুদ্ধ সত্যও আছে—বিশুদ্ধবাণী যথাসম্ভব বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে সেই অবিরুদ্ধ অংশই দেখিতে চেষ্টা করিবে। কারণ 'অবিভক্তং বিভক্তেষু'—ইহাই বিশুদ্ধ জ্ঞানের লক্ষণ।

পূর্ণের পথে চলিতে হইলে লক্ষ্যটা প্রথম হইতেই পূর্ণের দিকেই রাখিতে হয়। পূর্ণেই সকল বিরোধের সমন্বয় হয়। লক্ষ্য পূর্ণে থাকিলে ব্যবহারক্ষেত্রে গণ্ডীবদ্ধ ভাবের মধ্যেও মুক্ত সত্যের দর্শন পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের পাবন স্মৃতিতে সঞ্জীবিত ও রঞ্জিত হইয়া তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া আমরা সমগ্র বিশ্বকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিব—'বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্।'

বিশুদ্ধবাণী যোগীর বাণী। ইহার আদর্শ যোগীর আদর্শ। সুতরাং সাধনা, সিদ্ধি ও ভাবের প্রকার ভেদ যতই থাকুক সকলের মধ্যে সমভাবে একই মহা আদর্শ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। জগতের অনন্ত বৈচিত্র্যের মূলে ও অন্তঃস্থলে অভিন্নভাবে যে **এক** রহিয়াছে সেই এককে খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্যক। তবেই ত বৈচিত্র্যের সার্থকতা সিদ্ধ হয়। কর্ম সত্য, জ্ঞানও সত্য ; সক্রিয় ও সগুণ সত্য, নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণও সত্য ; সাকার সত্য, নিরাকারও সত্য ;—কিন্তু পরম সত্য তাহাই যেখানে কর্ম ও জ্ঞান, সক্রিয় ও অক্রিয়, সাকার ও নিরাকার একই অখণ্ড স্বরূপে প্রকাশমান হয়, শুধু যে একের দুইটি পরস্পর সংসৃষ্ট দিক্ বা পৃষ্ঠভূমিরূপে, তাহা নহে—কিন্তু একই অভিন্নরূপে।

বিজ্ঞান দৃষ্টিই সমন্বয় দৃষ্টি। রহস্যভেদ এই দৃষ্টিতেই হইতে পারে। কর্মের দৃষ্টিতে জগৎ সত্য, ভেদ সত্য, প্রতি ব্যক্তির মহিমা সত্য, আবার জ্ঞানের দৃষ্টিতে জগৎ মিথ্যা, ভেদ মিথ্যা, ব্যক্তিত্ব মিথ্যা। কিন্তু বিজ্ঞান দৃষ্টিতে দেখা যায় যে এক সত্যই মহাসত্য। জ্ঞানে যাহা মিথ্যা প্রতীত হয় তাহা তৎ তৎদৃষ্টিতে মিথ্যা হইলেও একেরই স্বাতন্ত্র্য-কল্পিত লীলাময় অনন্ত আত্মপ্রকাশরূপে পরম সত্য। বস্তুতঃ এক ছাড়া ত আর কিছু নাই—লীলাতীতরূপে

যে এক স্থির ও চির শান্ত, লীলারূপে সেই একই অনন্ত প্রকারে অনন্ত সাজে চিরকল্লোলময়। বস্তুতঃ শান্ত ও অশান্তের ভেদের প্রশ্নই সেখানে নাই। সেখানে এক যে এক সে প্রশ্নও যেন উঠিবার অবকাশ পায় না। রহস্যভেদ ও সংশয়ভঞ্জন এই স্থানেই হইয়া থাকে। গ্রন্থিমুক্ত হৃদয় না হইলে এই মহাস্থিতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না।

ইষ্ট, গুরু ও আত্মা এক না হওয়া পর্য্যন্ত ক্লান্তিময় যাত্রার অবসান নাই। চৈতন্যময় গুরুর কৃপাতে ইষ্টলাভ হয়, আনন্দরূপা শক্তির সন্ধান পাওয়া যায় ও কৃপাসহকৃত নিজ কর্মবলে তাঁহার প্রাপ্তি ঘটে। তখন অনিষ্টের নিবৃত্তি হয়, দুঃখের অবসান ঘটে ও নিজের দুর্বলতা ঘুচিয়া যায়। মাতৃস্তন্য-নিঃসৃত অমৃতধারাতে অভিষিক্ত হইলে শক্তিসম্পদে ও ঐশ্বর্য্য-গৌরবে আনন্দময় রাজ্যের সিংহাসন নিজের অধিগত হয়। তাহার পর এমন অবস্থা আসে যখন এই সিংহাসনের গরিমাতেও আর আবদ্ধ থাকা চলে না। তখন সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া অকিঞ্চনের ন্যায় আবার পথে বাহির হইতে হয়। যে পথিক পূর্বে গুরু-নির্দ্দিষ্টপথে তাঁহার কৃপা সম্বল করিয়া মাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল, এবার সে মায়ের সঙ্গে মিলিতভাবে গুরুকে খুঁজিতে বাহির হইল। পূর্ব্বে যে সে গুরুকে পাইয়াছিল তাহা ঠিক গুরুকে পাওয়া নহে। কারণ তাঁহাকে ত সে চায় নাই। চাহিতে না শিখিলে পাইতে পারা যায় না। তিনি দয়া করিয়া তখন তাহার কাছে আসিয়াছিলেন ছদ্মবেশে, স্বরূপে নহে ; তাহাকে ব্যথিত দেখিয়া তাহার ব্যথা দূর করিবার

জন্য আসিয়াছিলেন, আসিয়া আনন্দের বীজ-কণা দান করিয়া আনন্দভূমির পথ—মাকে পাওয়ার পথ—দেখাইয়া দিয়াছেন। আজ সে আনন্দময়—কারণ আনন্দময়ীরূপে মাকে সে পাইয়াছে।

মাই পূর্ণের সাকাররূপ। জগতে যেখানে যত আকার আছে—ইহারই অংশ, ইহারই কলা, ইহারই রশ্মি। সব রূপ এই পরম রূপেরই এক একটি ছটা মাত্র, সব রস এই পরম রসেরই কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র। গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—যেখানে যা আছে, সব ইহারই বিভূতি। বস্তুতঃ আমরা যে মূর্ত্ত বিগ্রহে চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা বিষয়ের রূপ রসাদি গ্রহণের জন্য নহে—মায়েরই রূপ রসাদি ধারণের জন্য। ভক্ত কবি বলিয়াছিলেন—"হেন কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ যে না পায় সে সম্বন্ধ, তার নাসা ভস্ত্রারই সমান।" বস্তুতঃ মা যে সর্ব্বেন্দ্রিয়বেদ্য তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব হয় এই মহাসাকার বিগ্রহের সাক্ষাৎকারে। সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, লাবণ্য, যৌবন, করুণা, বাৎসল্য, স্নেহ, প্রেম, ক্ষমা প্রভৃতি অনন্ত গুণরাশি সেখানে হিল্লোলিত হইতেছে।

দীর্ঘ সংসাররূপী মরু-কান্তার ভ্রমণে ক্লিষ্ট হইয়া প্রাণ প্রেমময়ী জগজ্জননীর সুশীতল অঙ্কে তৃপ্তিলাভ করে। কিন্তু পূর্ণের যাত্রীর পক্ষে এই বিশ্রামও সাময়িক বিশ্রাম মাত্র। তাই ইহাও ত্যাগ করিতে হয়। ঠিক **ত্যাগ** বলা চলে না, কারণ যোগীর ত্যাগ নাই—তবে ইহাকেও ছাড়াইয়া আগে চলিতে হয়।

তখন মা যেন অদৃশ্য হইয়া যান—নিজের আড়ালেই যেন

নিজেকে ঢাকিয়া ফেলেন। যাত্রীর সঙ্গে অভিন্ন রূপে থাকেন, কিন্তু আর পৃথক্ ভাবে দৃষ্টির সম্মুখীন হইয়া দেখা দেন না। তখন যেন সন্তান আর সন্তান নয়, মাও যেন আর মা নন—যেন দুইই এক সত্তা।

এইবারকার যাত্রা বড় কঠিন, পথ বড় দুর্গম—কারণ চৈতন্যময় গুরু নিরাকার নির্গুণ ও নিষ্কল। কর্মের পথে মাকে পাওয়া যায়—তারপর জ্ঞানের আলোকে গুরুকে খুঁজিতে হয়। আনন্দেরও অতীত সত্তা আছে। যাহা চৈতন্যময় জাগ্রৎসত্তা সেখানে নিরানন্দ ত নাই-ই, আনন্দেরও হিল্লোল উঠে না। আনন্দও ত এক প্রকার মোহ—তৃপ্তিমোহ! যেটি শান্ত চৈতন্যময় মহাসত্তা সেইটি গুরু-সত্তা। ঐ পথে কৃপার বারিবর্ষণ হয় না—কৃপা-শূন্য অসহায় নিঃসম্বল যাত্রীকে একমাত্র নিজের অন্তঃসম্পদের উপর নির্ভর করিয়া অতিকষ্টে পথ অতিক্রম করিতে হয়। যে একদিন মহামায়াতে অধিষ্ঠিত হইয়া পরম ঐশ্বর্য্যময় আসনের অধিকারী হইয়াছিল আজ সেই রাজপুত্র সত্যই পথের কাঙ্গাল। কুবের যাঁহার ভাণ্ডারী ও অন্নপূর্ণা যাঁহার গৃহলক্ষ্মী সেই শিব আজ সত্যই পথের ভিখারী। নিরাকারের ধারণা অতি কঠিন। সাকারের মধ্যে নিরাকার আছে, সাকার রাজ্য অতিক্রম করার পরও সেই নিরাকারই যেন অনন্ত আকাশবৎ বিরাজমান থাকে। স্বয়ং নিরাকার না হইলে সেই নিরাকারের সাক্ষাৎকার হয় না। তখন সেই মহানিরাকার সত্তাতে সন্তান নিরাকার, মাও নিরাকার। ইহাই গুরু প্রাপ্তির একটি প্রধান দিক্। তখন একমাত্র গুরুই নিজের

মহাপ্রকাশে অখণ্ডরূপে বিরাজ করেন—এইটি অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন মহাব্যোমবৎ নিষ্কম্প নিঃস্পন্দ মহাসত্তা। গুরুপ্রাপ্তির পথটি অতি ভয়াবহ—মানস সরোবর হইতে মনোহর তীর্থ পর্য্যন্ত ইহা বিস্তৃত। ইহাই ঊর্দ্ধ মার্গ।

ইহার পর অতর্কিত এক মহাক্ষণে কৃপাশূন্য অবস্থা কাটিয়া যায়—গুরুর মহাকৃপাতে শিষ্য নিজেকে চিনিতে পারে। নিজে কে? স্বয়ম্। যিনি সকলের স্ব—মায়ের স্ব, গুরুর স্ব, যাত্রী শিষ্যেরও স্ব—সেই একই আত্মা সকলের আত্মা। ইহাই বিজ্ঞানের চরম রহস্য। ইহাই প্রকৃত আত্মলাভ। ইহাই স্বভাব। কর্মে মা, জ্ঞানে গুরু, বিজ্ঞানে স্বয়ম্। কর্মে সাকার, জ্ঞানে নিরাকার, বিজ্ঞানে সাকার-নিরাকার উভয়ের অতীত অথচ উভয়াত্মক। মা সাকার, গুরু নিরাকার—মা যখন গুরুর সহিত অভিন্ন তখন মাও নিরাকার, গুরু যখন মার সহিত অভিন্ন তখন গুরুও সাকার, কিন্তু বিজ্ঞান-সূর্য্যের উদয় হইলে আত্মসাক্ষাৎকারের ক্ষণে দেখা যায় আত্মা স্বয়ং সাকার নিরাকার উভয়ের অতীত হইয়াও যুগপৎ সাকার ও নিরাকার উভয় রূপেই প্রকাশমান। বস্তুতঃ আত্মাই গুরু—আত্মাই মা। তখন আত্মা ও নৈরাত্ম্যের দ্বন্দ্বও চিরদিনের জন্য শান্ত হইয়া যায়।

তখন মা, গুরু ও স্বয়ম্—তিনেই এক, একেই তিন। বস্তুতঃ তিনই **এক**, একই তিন। তখন কর্ম, জ্ঞান ও বিজ্ঞান অদ্বয়—মা, গুরু ও আত্মাও অদ্বয়। উপায় ও উপেয় অভিন্ন। দুইটি অদ্বয়তত্ত্ব বস্তুতঃ একই পরমাদ্বয় তত্ত্বাতীত পরমতত্ত্ব।

ইহারও অতীত আছে। যদিও এই স্থিতি নিত্য বর্ত্তমান ও দেশ কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, তাই **অতীত** বলা আর চলে না, তথাপি বলিতে হয়। অতীত আছে, অনাগতও আছে—নিত্য বর্ত্তমানেই সেটি ভাসে। এই স্থিতি অব্যক্ত—যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। ইহা বাণীর অতীত—এমন কি **বিশুদ্ধ বাণীও** সেখানে উপনীত হয় না।

বিশুদ্ধ বাণীর কতটা দৃষ্টিক্ষেত্র তাহা ইঙ্গিতে প্রকাশ করা হইল। কিন্তু ইহার প্রসারের মূলে আছে সেই উৎস, যাহা অন্ধকে চক্ষুষ্মান্ করে, মূককে বাচাল করে ও পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করায়। গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্। জয় গুরু।

বিশুদ্ধানন্দ মাহাত্ম্য

রায় সাহেব শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, কবিরত্ন, এম-এ

এক শ্রেণীর লোকের কাছে সাধু, বিশেষতঃ কোনও বেশধারী সাধু মাত্রেই যোগী। আর যোগী হইলেই তাহার যে নানা অলৌকিক সিদ্ধি থাকিবেই এ বিষয়েও তাহাদের সন্দেহ প্রায় দেখা যায় না। সেইজন্য সাধুমাত্রেরই কাছে রোগের ঔষধ, মোকদ্দমায় জয়, পুত্রের চাকরী বা সুমতি, কন্যার বিবাহ বা সন্তান লাভ ইত্যাদির সমুচিত ব্যবস্থার আশায় লোকে ভিড় জমায়। সাধক বা সিদ্ধ পুরুষদিগের মধ্যে জ্ঞানী, ভক্ত ও যোগী এই যে শ্রেণীবিভাগ অপেক্ষাকৃত বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ করিয়া থাকেন ইহার তত্ত্ব সাধারণ লোকে বড় জানে না। ঈশ্বরের সহিত যাঁহার যোগ অর্থাৎ সংযোগ আছে সাধারণের ধারণা তিনিই যোগী এবং সেরূপ যোগ একবার স্থাপিত হইলেই ঈশ্বর হইতে অলৌকিক সিদ্ধিসকল আসিয়া পড়িবেই, ইহা সাধারণের কাছে একরূপ স্বতঃসিদ্ধ সত্য। যিনি যত বড় সাধু তাঁহার ক্ষমতা তত অধিক হইবে—ইহাতে কাহারও সন্দেহ প্রায় দেখা যায় না।

ঈশ্বর বা পরতত্ত্বের সহিত সংযোগ স্থাপন যে সাধন মাত্রেরই উদ্দেশ্য ইহা অবশ্যই পণ্ডিতগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। তবে তাঁহারা জানেন সাধনেরও প্রকার ভেদ আছে। কেহ বুদ্ধি-প্রদীপ্ত

বিচার দ্বারা, কেহ ভক্তি-প্রণোদিত সেবা দ্বারা, কেহ দেহেন্দ্রিয়-শোধন-সমর্থিত ধ্যান দ্বারা, সেই সংযোগ সাধনের চেষ্টা করেন। এইরূপে মোটের উপর এই ত্রিবিধ সাধন-ধারা অনুসারে জ্ঞানী, ভক্ত ও যোগী এই তিন বিভিন্ন শ্রেণীর সাধুর অর্থাৎ সাধক ও সিদ্ধদের শ্রেণী বিভাগ কল্পিত হইয়াছে।

যেখানে শ্রেণী থাকে, সেখানে কোন্‌টি উচ্চ আর কোন্‌টি নীচ এই তর্কও উঠে। এইরূপ তর্ক নিয়া বিভিন্ন বাদীদের মধ্যে বহু জল্প বাদ বিতণ্ডা হইয়াছে এবং এখনও হয়। বহু গুরুগম্ভীর গ্রন্থ রচিত হইয়াছে যাহা পণ্ডিতেরা ও বিদ্যার্থীরা পড়েন এবং পড়িয়া জল্প বাদ বিতণ্ডার জন্য প্রস্তুত হন।

সাধারণ লোকের বিচারবুদ্ধি একটি মানই মানে। সেটি হইতেছে, যে সাধুর অলৌকিক সামর্থ্য বেশী সেই উচ্চ। এইরূপে তাহারা যেমন সকল সাধুকেই যোগী বলে, তেমনই তাহাদের মধ্যে উক্ত অর্থাৎ পণ্ডিতগণকৃত শ্রেণী বিভাগ অনুসারে যাহারা প্রকৃত যোগী তাহাদিগকেই তাহারা উচ্চতম স্থান দেয়। কেননা যোগীদিগেরই অলৌকিক সিদ্ধি বেশী।

সকল সাধন প্রণালীতেই আদিতে একটা উদ্যোগপর্ব্ব, মধ্যে যুদ্ধ পর্ব্ব বা ক্রিয়া পর্ব্ব, অন্তে শান্তি পর্ব্ব আছে। শ্রদ্ধা বা আস্তিক্য বুদ্ধি ও নিষ্ঠা সকল শ্রেণীরই প্রবেশিকা বলিয়া গণ্য, তারপর মার্গ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্ব অতিক্রম করিতে হয়।

জ্ঞান মার্গের উদ্যোগ পর্ব্বে নিত্য ও অনিত্য বস্তুর মধ্যে

অর্থাৎ আত্মা ও দেহ, ঈশ্বর বা পরমাত্মা ও জগৎ, ইহাদের মধ্যে যে ভেদ আছে তাহার উপলব্ধি, তৎপর ঐহিক ও পারত্রিক ফল-ভোগের প্রতি বৈরাগ্য এবং শম দম ইত্যাদি অনুশীলন করিতে হয়। ইহাতে একটা আনন্দ অবশ্যই আছে, পরন্তু কোনও শক্তির বিকাশ নাই বলিলেই চলে। ক্রিয়া পর্ব্বে বিচার এবং শান্তি পর্ব্বে জ্ঞানের পরিপাক ও অখণ্ড শান্তি ও বৈরাগ্য। শক্তির বা "সিদ্ধির" কথা এখানে বড় উঠে না।

ভক্তি-মার্গে উদ্যোগ পর্ব্বে সেবা আরম্ভ হয় শ্রীমন্দির মার্জ্জন ইত্যাদি দ্বারা, তারপর নাম-কীর্ত্তন। ক্রিয়া পর্ব্বে গভীরতর নাম সাধন, ইষ্টমূর্ত্তির ভোগরাগ, ইষ্টলীলা চিন্তনাদি। তারপর শান্তি পর্ব্বে আসে প্রেম-পরিপাক এবং অখণ্ড লীলা রসাস্বাদ। এখানেও শক্তির কথা উঠে না। ভক্ত সেবাই চান, শক্তি চান না।

যোগমার্গের কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহার উদ্যোগ পর্ব্ব যেমন দীর্ঘ ও দুরতিক্রম, তেমনই এক একটি ধাপ আয়ত্তির সঙ্গে সঙ্গে অযাচিতভাবে শক্তি আসিতে থাকে। সাধনাবস্থায় যোগী ঐ সকল শক্তিতে সন্তুষ্ট থাকেন না, কারণ তাহাতে অগ্রগতিতে বাধা হয়। কিন্তু শক্তিগুলি থাকেই এবং পরার্থে প্রয়োগও চলে। সাধারণতঃ যোগ অষ্টাঙ্গ বলা হয়। ঐ অঙ্গগুলি একটির পর একটি ক্রমোর্দ্ধ স্তর বলা যায়। সর্ব্ব নিম্নস্তরে "যম" বা বহিরিন্দ্রিয় সংযম ; তাহার অর্থ হইতেছে অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ বা ভোগবিলাসাদির দ্রব্যাহরণে অনিচ্ছা। ইহার পরের

স্তরে "নিয়ম" বা অন্তরিন্দ্রিয় সংযম ; তাহার অর্থ শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় (অর্থাৎ যোগশাস্ত্রাধ্যয়ন বা ইষ্টমন্ত্রজপ) এবং ঈশ্বর-প্রণিধান বা সকল কর্ম্ম পরম গুরুতে সমর্পণ। ইহার পর আছে আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার বা ইন্দ্রিয়সমূহের বহির্গতি রোধ। এই পর্য্যন্ত উদ্যোগপর্ব্ব বলা যায়। তৎপর ক্রিয়া পর্ব্বে ধারণা (চিত্তকে একস্থানে স্থাপন), ধ্যান ও সমাধি। শান্তি পর্ব্বে সম্প্রদায় অনুসারে কৈবল্য, ঈশ্বর-সাযুজ্য, "মায়ের কোলে বসিয়া মায়ের লীলা দেখা" ইত্যাদি।

যোগ মার্গে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক স্তর অতিক্রম বা আয়ত্তীকরণের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি অলৌকিক শক্তি আপনা হইতেই আসে। প্রবৃত্ত মাত্র যোগীকেও 'আমি এ সব চাই না' বলিয়া ন্যাকামি করিতে হয় না। অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে যোগীর নিকট হিংস্র জন্তরা হিংসাত্যাগ করিবেই। 'ইহা চাই না' বলিবার অর্থ কি ? সত্যকথনের প্রতিষ্ঠায় বাক্‌সিদ্ধি আসিবেই, যোগীর মুখ হইতে যাহা বাহির হইবে তাহা কার্য্যে অবশ্যই সত্য হইবে। অচৌর্য্যের ফলে সমস্ত ধনরত্ন আপনা হইতে উপস্থিত হইবে ; যোগী অবশ্য নিঃস্পৃহতা পোষণ করিয়াই চলিবেন। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায় চিত্তের অসাধারণ সামর্থ্য, এবং অপরিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় 'আমি প্রাক্তন জন্মে কে ছিলাম, কিরূপ ছিলাম, বর্ত্তমান জন্মেই বা আমার স্বরূপ কি, পরেই বা কি হইব' এই সকল জ্ঞান আপনা হইতে আসিবে। এইরূপ "নিয়মের" এক একটি ধাপ অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে সত্ত্ব-শুদ্ধি, সৌমনস্য, একাগ্রতা, ইন্দ্রিয়জয়, আত্মদর্শনযোগ্যতা. অনুত্তম অর্থাৎ যৎপরোনাস্তি সুখলাভ, অণিমা লঘিমা ইত্যাদি

সিদ্ধি, দূরশ্রবণ, দূরদর্শন, ইষ্টদেবতা দর্শন, দেশান্তরে বা কালান্তরে ঘটিত যাহা জানিবার ইচ্ছা হয় তাহা যথার্থভাবে জানা—এই সকল শক্তি আসে। ইহার পর আসন ও প্রাণায়াম —এই দুইটি ব্যাপারে সিদ্ধি লাভ করিতেও বহু প্রযত্নের প্রয়োজন। ইহাতে সিদ্ধির ফল হইতেছে শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহন ক্ষমতা এবং জ্ঞানের আবরক কর্ম্মের ক্ষয়। তৎপর প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের উপর অবাধ ক্ষমতা জন্মে।

এইরূপে দেখা যায় উদ্যোগপর্ব্বেই যোগ মার্গে প্রবৃত্ত সাধকের কতকগুলি শক্তি আসিয়া পড়ে। যে ব্যক্তি ভাগ্যক্রমে উপযুক্ত গুরু লাভ করে, সে যদি গুরুর উপর নির্ভর করিয়া বিপুল প্রযত্ন সহকারে ঐ পথে চলিতে থাকে তবে তাহার ঐ সকল শক্তি অখণ্ডভাবেই আসিবে।

তারপর ক্রিয়ার অবস্থা অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি— ইহাতে সাফল্যে যে কি না হয় তাহা বলাই কঠিন। এই তিনটি ক্রিয়ার সমষ্টিগত নাম "সংযম"। সংযম দ্বারা জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ প্রাপ্তি ঘটে, যাহা জ্ঞানীর কাম্য হইলেও সব সময়ে অধিগম্য নয়।

এই ধরুন বস্তুর ত্রিবিধ (অর্থাৎ ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা) পরিণামে সংযম করিলে অতীত ও অনাগত জ্ঞান দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়। শব্দ ও অর্থের ভাগ করিয়া তাহাতে সংযম করিলে প্রাণি-মাত্রেরই উচ্চারিত শব্দের অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়। সংস্কারে সংযম করিলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু জন্মের জ্ঞান হয়। পরচিত্তে সংযমে

তাহা প্রত্যক্ষবৎ হয়, সে কি ভাবিতেছে তাহা জানা যায়। কায়গতরূপে সংযম করিলে দেহকে পরের অদৃশ্য করা যায়। সূর্য্যে সংযম করিলে চতুর্দ্দশ ভুবনের জ্ঞান হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহাকেই বলে যোগীর ঐশ্বর্য্য। "ঐশ্বর্য্য" শব্দটি "ঈশ্বর" শব্দ হইতে উৎপন্ন—উহার অর্থ ঈশ্বরত্ব—ঈশ্বরের ভাব বা কর্ম্ম। এইজন্য বলা হয় যোগীই ঈশ্বর ঈশ্বরই যোগী। দেবতাদিগের মধ্যে শিব হইতেছেন ঈশ্বর, মহেশ্বর। তিনি যোগী। ঐশ্বর্য্যের অপর নাম বিভূতি। ঐ শব্দের লৌকিক ভস্ম অর্থ ধরিয়া বলা হয় মহেশ্বরের শরীর সর্ব্বদা বিভূতিতে লিপ্ত থাকে।

বাঙ্গালা দেশ এককালে ছিল শাক্ত যোগীদের দেশ,—তখন মহামহাশক্তিশালী যোগিগণ এই দেশে আবির্ভূত হইয়াছেন। বৌদ্ধ যোগীও বহু ছিলেন। ভক্তিমার্গে যেমন নানা সম্প্রদায় ও শাখা আছে, সেইরূপ যোগমার্গেও বহু প্রস্থান অর্থাৎ সম্প্রদায় বা পথ আছে। সকলের সাধন প্রণালী একই বর্ত্ম ধরিয়া চলে না। কিন্তু সকল প্রস্থানেই শক্তিবিকাশের সুযোগ আছে। বহুকাল পর্য্যন্ত অন্য প্রদেশের সাধুরা বাঙ্গালী সাধুদিগের অলৌকিক শক্তিমত্তায় বিশ্বাস করিত। এখনও এই খ্যাতি সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই। সম্প্রতি পরলোকগত কঠোর জ্ঞানবাদী সাধক সাধু শান্তিনাথ নিজ জীবন-কথার বিবরণে লিখিয়াছেন, অমরকণ্টকে নির্জন ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু সমাকুল অরণ্যে সাধন করিবার সময় ঐ অঞ্চলে সাধারণ লোকের মনে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে এই বাঙ্গালী সাধু ব্যাঘ্র হইয়া বনে বিচরণ করে। সেইজন্য তাহারা তাঁহাকে বাঘোয়া বাবা বলিত। অমরকণ্টকের কোনও

কোনও সাধুও যে ঐ ধারণা হইতে মুক্ত ছিল না তাহারও বিবরণ শান্তিনাথ স্ব-জীবন-কথায় দিয়াছেন।

সে যাহা হউক, চৈতন্য মহাপ্রভুর আদর্শে বাঙ্গালাদেশে যোগ সাধনের স্থলে ভাবের বন্যা ও দলবদ্ধভাবে নাম কীর্ত্তনের নেশা আসিয়া পড়ে এবং ক্রমে যোগসিদ্ধির পরিবর্ত্তে অশ্রু, স্বেদ, কম্প ইত্যাদি সাত্ত্বিক বিকার আধ্যাত্মিক উন্নতির মান বলিয়া পরিচিত হয়। এমন কি জ্ঞান মার্গও অরসজ্ঞ কাকের আস্বাদ্য নিম্বফল বলিয়া নিন্দিত হইতে থাকে।

কিন্তু দেখা গিয়াছে ভক্তিপথে প্রবৃত্ত কোনও কোনও মহাপুরুষের মধ্যে দুই একটি শক্তির কাদাচিৎক পরিচয় পাওয়া গেলে, যোগবিভূতির নিন্দাকারী তদীয় ভক্তগণ তাহাই পুনঃ পুনঃ ফলাও করিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না।

আধুনিক কালে বাঙ্গালা দেশে যোগী কম আবির্ভূত হইলেও, অনেক যোগী আছেন এবং যোগীদিগের স্বভাব অনুসারে প্রায়শঃ তাঁহারা প্রচ্ছন্ন ভাবেই থাকেন। সম্প্রতি পরলোকগত বরদাচরণ মজুমদার ইঁহাদের একজন। মৃত্যুর পর তাঁহার কথা একখানি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হওয়া পর্য্যন্ত, তিনি সকলের নিকট প্রায় অজ্ঞাতই ছিলেন। প্রচ্ছন্ন যোগিগণের নাম কদাচিৎ কোনও ঘটনাসূত্রে প্রকাশ হইয়া পড়ে। কাহারও কাহারও নাম তিরোভাবের পরে প্রকাশ পায়।

তিন জন বাঙ্গালী মহাযোগীর নাম একান্তই প্রচ্ছন্ন থাকিবার যোগ্য ছিল না বলিয়া তাঁহাদের জীবদ্দশায় খুব ব্যাপকভাবে না

হইলেও প্রকাশ হইয়াছিল। ইহারা কেহই আত্ম-প্রচার ইচ্ছা বা অনুমোদন করিতেন না। এই তিন জন হইতেছেন—(১) কাশীর শ্যামাচরণ লাহিড়ী, (২) বারদির লোকনাথ ব্রহ্মচারী, ও (৩) বর্দ্ধমানের ও পরে কাশীর বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস।

ইহাদের মধ্যে এক শ্রীশ্রীবাবা বিশুদ্ধানন্দকেই দেখিয়াছি। অন্য দুইজনকে দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই। লাহিড়ী মহাশয়ের প্রচ্ছন্ন যোগী শিষ্য দুই একজনের নাম শুনিয়াছি। লাহিড়ী মহাশয় ও লোকনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সম্পর্কেও অল্প কথাই এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তবে তাঁহারা যে অত্যুন্নত যোগী ছিলেন ইহা বাবা বিশুদ্ধানন্দের মুখে শুনিয়াছি। অবাঙ্গালীদের মধ্যে তিনি গোরক্ষপুরের গম্ভীরনাথ ও কাশীর তৈলঙ্গ স্বামীকে যোগিরূপে মান্য করিতেন।

বাবা বিশুদ্ধানন্দের যে কত শক্তি ছিল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তাহার কারণ তিনি ১৪ বৎসর মাত্র বয়স হইতে সুদীর্ঘ ২২ বৎসর কাল তিব্বতে জ্ঞানগঞ্জ নামক বহু প্রাচীন একটি যোগাশ্রমে শত শত বর্ষজীবী যোগিগণের শিক্ষা ও পরিচালনাধীন থাকিয়া স্ব-সম্প্রদায়ে প্রচলিত (অনেকগুলি অন্য সম্প্রদায়ে অজ্ঞাত) সকল প্রকার যোগক্রিয়া আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তদুপরি সূর্য্য-বিজ্ঞান নামে এক অতি প্রাচীন ও অতি রহস্য (এবং অন্য সম্প্রদায়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত) বিজ্ঞান শুধু শিক্ষাই করেন নাই, সে বিষয়ে জীবনব্যাপী গবেষণাও করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণকে তাহার অমৃতময় ফল বিতরণ করিবার তাঁহার যে ইচ্ছা ছিল, বিধাতার ইচ্ছায় তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই।

সূর্য্যবিজ্ঞান দ্বারা সকল শক্তির মধ্যে সুদুর্লভ সৃষ্টিশক্তি লাভ করা যায়। একখানি লেন্স্ (lens) এর সাহায্যে সূর্য্যবিজ্ঞান দ্বারা বাবা বিশুদ্ধানন্দ যে কত বিচিত্র রকমের বস্তু প্রায়ই চক্ষের নিমেষে সৃষ্টি করিতেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না, ভাবিয়া অবাক্ হইতে হয়। তাঁহার শিষ্য মাত্রেই, এবং অশিষ্যও অনেকে, এমন কি জার্ম্মাণ, মার্কিণ, ও ব্রিটিশ ভ্রমণকারী বা সাংবাদিকেরাও, উহার কিছু কিছু দর্শন করিয়াছেন। শেষোক্ত ব্যক্তিগণ পুস্তকে বা সংবাদ পত্রে তাহা প্রকাশও করিয়াছেন।

এই যে সৃষ্টি-ক্ষমতা ইহা ঐশ্বরিক ক্ষমতা—প্রকৃত ঐশ্বর্য্য। বাগ্মিতাবলে চিত্তরঞ্জক ভাবে ধর্ম্মকথা খ্যাপন, বিদ্যাবলে গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ, ভাবের প্রাচুর্য্যে কীর্ত্তনে নর্ত্তন বা গান গাহিয়া লোককে মাতান উহার তুলনায় নগণ্য, যদিও ইহার কোনও কোনওটি সাধুত্বের নিদর্শন বলিয়া গণ্য হয় এবং দীক্ষার্থীও আকর্ষণ করে। তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের রীতিতে demonstration করিতে কাহাকে দেখা যায়? যোগ-শাস্ত্রের "সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকম্" এ তত্ত্ব সকলেই শুনিয়াছেন, অনেকে যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যাও করিয়াছেন ও করেন, কিন্তু হাতে হাতে একটা গোলাপ ফুলকে জবায়, একটা জবাকে প্রবালে, একটা বেলফুলকে স্ফটিকগোলকে পরিণত করিয়া কয় জন দেখাইয়াছেন? অথচ বাবা বিশুদ্ধানন্দ ইহা হরদম করিতেন। তিনি একদিন কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "বাপু, একটা ঘাসের ডগা নির্ম্মাণ করিতে পারে এরূপ একটি লোক আমাকে দেখাও না।" তিনি ইচ্ছাশক্তি দ্বারা জাম গাছে, ভেরেণ্ডা গাছে আঙ্গুর ফলাইয়াছেন, একটা

জবাগাছকে চিরদিনের মত গোলাপ গাছে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। একটি মার্কিণ সাংবাদিককে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিয়া লেন্সের সাহায্যে একটা শুক্না কাঠের অর্দ্ধাংশ মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রস্তরে পরিণত করিয়াছিলেন, অন্য এক য়ুরোপীয় দর্শকের স্বহস্ত-নিহত চড়াই পাখীকে পুনর্জীবন দিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ লিখিয়াছেন,—"অণিমা ও মহিমা বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে একদিন আঙ্গুল মোটা করিয়া দেখাইয়াছিলেন। * * * হীরক, সুবর্ণ, মুক্তা, প্রবাল প্রভৃতি শত শত প্রকারের বস্তুর নির্ম্মাণ-ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়াছি। জীবের মধ্যে মাছি, চামচিকা প্রভৃতি জীবজন্তু তৈয়ার করিতে দেখিয়াছি।"

তাঁহার বিভূতির সীমা পরিসীমা ছিল না বলিলেই চলে। শ্রীকৃষ্ণ স্বমুখ-বিবরে যশোদাকে বিশ্ব দর্শন করাইয়াছিলেন, ইহা পুরাণে আছে। বাবা বিশুদ্ধানন্দ কথা-প্রসঙ্গে স্বল্প-পরিমাণ স্থানে বিশ্ব-দর্শনের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন পুরীর পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় সদাশিব মিশ্রকে স্বমুখ-বিবরে বিশ্ব দর্শন করাইয়া তাঁহার সংশয় অপনোদন করিয়াছিলেন। বিষ্ণুর পদ্মনাভ নাম পুরাণ-প্রসিদ্ধ। তাঁহার নাভি হইতে উদ্গত সনাল পদ্ম মধ্যে পুরাণানুযায়ী ব্রহ্মার চিত্র বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। সকলেরই নাভিতে যে পদ্ম আছে তাহা বাবা বিশুদ্ধানন্দ একাধিক দিন স্ব-নাভি বিস্ফারিত করিয়া তাহা হইতে সনাল পদ্ম বাহির করিয়া শিষ্যগণকে দেখাইয়াছেন। ইহাই তাঁহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের রীতিতে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা। ইহাতে বেশী বাগ্‌বৈচিত্র্যের প্রয়োজন হয় না, ভাবে গলিয়া শ্রোতাকে গলাইবার

প্রয়োজন নাই; অথচ দর্শক ও জিজ্ঞাসু সংছিন্ন-সংশয় হইয়া যায়।

আশ্চর্য্যের বিষয়, এত সকল অপরিমেয় শক্তি সত্ত্বেও বাবাজী প্রচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসিতেন এবং অনেকটা ছিলেনও প্রচ্ছন্নভাবে। তিনি আশ্রমে কৌতূহলী দর্শকের আনাগোনা পছন্দ করিতেন না। অধিকারী ভিন্ন সকলকে ধর্ম্মকথা শুনাইয়া বাক্‌শক্তির অপচয় করিতেন না। আশ্রমে ঘটা করিয়া কীর্ত্তন বা দরিদ্র-ভোজনের আয়োজন করিয়া লোক আকর্ষণ করিতেন না। কেবল শিষ্যগণের কল্যাণে তিনি আশ্রমে নানা পর্ব্বে কুমারী ভোজনের ব্যবস্থা করিতেন এবং তদুপলক্ষে আহুত অনাহুত শত শত কুমারী সেবা পাইতেন। তিনি সাক্ষাৎ দেখিতেন এবং শাস্ত্রেও ইহার সমর্থন আছে যে, কুমারী কন্যারা জগতের অসঙ্গা আদিজননীরই প্রতিনিধি।

অনেকেরই ধারণা আছে জ্ঞানীরা নীরস প্রকৃতির এবং যোগীরা কঠোর প্রকৃতির লোক; কেবল ভক্তেরাই রসে ভরপূর। বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণ ভগবানের মাধুর্য্য চিন্তায় সর্ব্বদা মস্‌গুল থাকেন বলিয়া তাঁহাদের প্রকৃতিও মধুর হইয়া যায়। বৈষ্ণবগণের এই খ্যাতির যথার্থতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ প্রকাশ না করিয়াও নিঃসংশয়ে বলা যায় যে জ্ঞানীকে নীরস এবং যোগীকে কঠোর হইতেই হইবে এরূপ কোনও নিয়ম নাই। জ্ঞানমার্গে সাধককে হর্ষামর্ষ উভয়ই ত্যাগের উপদেশ দেওয়া হয় বটে, কিন্তু সুন্দরের সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইতে হইবে না বা দয়া পরোপকার-প্রবৃত্তি প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে,

এরূপ কোনও বিধি নাই—সবই জ্ঞান-প্রদীপ্ত ভাবে করিতে হইবে, কেবল চিত্তচঞ্চলকারী ভাবের আবেগে নয়, ইহাই তাহাদের শিক্ষণীয় ও আচরণীয়। যোগী সম্বন্ধেও উহাই বলা যায়। পরম-তত্ত্ব অরূপ অথচ বিশ্বরূপ, নিরাকার অথচ সর্ব্বাকার। তাহাতে সর্ব্বরসের সমন্বয় রহিয়াছে। রসো বৈ সঃ। যিনি তাঁহাকে নিবিড়-ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন তিনিও সকল রসে নিষ্ণাত হইবেন। যোগীর ঐশ্বর্য্যে অর্থাৎ ঈশ্বরত্বে বা তত্তুল্যতায় কি ঈশ্বরের মাধুর্য্যের স্থান নাই? যোগী যে ঈশ্বরবৎ পূর্ণ, তাঁহাতে কোনও রূপ অপূর্ণতা থাকিবে কি করিয়া? তবে মাধুর্য্যের যে একটা অর্থ বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত তাহার অসংযত চর্চ্চায় গ্রাম্যধর্ম্মের দিকে প্রবণতা আসিতে পারে এবং বহু স্থলে আসিতেও দেখা গিয়াছে। বিষয়টির অধিক বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। যোগী বা জ্ঞানী ঈশ্বর সম্পর্কেও সেরূপ মাধুর্য্য চর্চ্চার সমর্থন করেন না। কেননা পথটা পিচ্ছিল। প্রকৃত ভক্তেরা ঈশ্বর সম্পর্কেই সেরূপ মাধুর্য্য চর্চ্চা নিবদ্ধ রাখেন। অন্য ক্ষেত্রে উহার নিন্দা বৈষ্ণবশাস্ত্রেও প্রসিদ্ধ। তবে পথের পিচ্ছিলতা সম্বন্ধে ভাবপ্রবণ সাধকের সর্ব্বদা সাবধান থাকা কঠিন, এ বিষয়ে বোধ করি সকলে সম্যক্ সতর্ক নহেন।

সে যাহা হউক, আমরা শ্রীশ্রীবাবা বিশুদ্ধানন্দ সম্পর্কে আলোচনা করিতে বসিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি এই মহাযোগী যদিও অনেক সময়ে শিষ্য-পরিবেষ্টিত হইয়াও নীরবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিতেন এবং শিষ্যদিগকে নীরবে সচ্চিন্তা করিবার সুযোগ দিতেন, তথাপি প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে প্রচুর হাস্যরস ও

অন্যান্য রস অবতারণ ও বিতরণ করিতেন। তিনি ষড়্‌রসে রসিক ছিলেন। তাঁহার হাস্যরস যেমন ছিল শিষ্যগণের মনোরঞ্জনার্থ, তেমনই ক্রোধও ছিল তাহাদের কল্যাণার্থ। তিনি যেমন অতি অল্প কথায় লোককে হাসাইতে পারিতেন তেমনই অতি অল্প কথায় ক্রোধ প্রকাশ করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিতেন। আর তাহার ফল তিক্ততাবর্জ্জিত ছিল বলিয়া তাঁহার ক্রোধ রসাঙ্গই ছিল। তিনি চল্‌তি ভাষায়ই কথা বলিতেন, তাহাতে কৃত্রিমতাও যেমন থাকিত না, গ্রাম্যতাও তেমনই থাকিত না। তাঁহার কোনও আচরণেই কৃত্রিমতার বা লোক-দেখানো ভাবের লেশমাত্রও ছিল না।

কঠোরতা যোগের অপরিহার্য্য দোষ নয়। কোনও যোগীতে যদি কঠোরতা দেখা যায়, তবে বুঝিতে হইবে উহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত প্রকৃতির ছাপ রহিয়াছে অথবা যাহা আরও অধিক সত্য হওয়া সম্ভব, উহা প্রয়োজনাধীনরূপে কৃত্রিম। যোগী কখনও দয়া মায়াহীন হইতে পারেন না। বাহিরের কঠিন আবরণের অন্তরালে প্রচুর করুণা ও সহানুভূতি তাঁহাতে থাকিবেই। কেননা চিত্তের পরিকর্ম্ম বা পরিমার্জ্জন বা মলাপনয়নের সাধনরূপে তাঁহাকে যে পরের সুখ দেখিয়া ঈর্ষ্যার পরিবর্ত্তে মৈত্রী, দুঃখ দেখিয়া করুণা, পুণ্য দেখিয়া মুদিতা (হর্ষ), এবং পাপ দেখিয়া ঘৃণা বা বিদ্বেষের পরিবর্ত্তে উপেক্ষা অভ্যাস করিতে হইয়াছে। বাবা বিশুদ্ধানন্দে এ সকলই প্রচুর পরিমাণে দেখা গিয়াছে। তাঁহার হৃদয় ছিল অতি কোমল। মুখে ঔদাসীন্য এমন কি বিরক্তি প্রকাশ করিলেও শিষ্যের দুঃখে, রোগে, কষ্টে সমুচিত

ব্যবস্থা অবলম্বন তিনি অনেক সময়ে তাহার অজ্ঞাতসারেই করিতেন, অনেক সময়ে অযাচিত হইয়াও করিতেন। তিনি বহু বহুবার রোগীর রোগ নিজে টানিয়া নিয়া তাহাকে রোগমুক্ত করিয়াছেন বা তাহার ক্লেশের প্রচুর লাঘব করিয়াছেন। বস্তুতঃ ঐভাবে তিনি নিজ জীবনই দান করিয়াছেন। চরিত্রের ঔদার্য্য মাধুর্য্য ইহা অপেক্ষা অধিক কি কল্পনা করা যায়? শিষ্যেরা ছিল তাঁহার প্রাণ। 'আমি সমস্ত জগদ্বাসীর উপকার করিতেছি', এমন ছেঁদো কথা তিনি কখনই বলিতেন না। কিন্তু তাঁহার জীবন ছিল জগতের শিক্ষার স্থল। বহু লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করুক এরূপ আকাঙ্ক্ষা তিনি কখনও করেন নাই। অথচ তাঁহার কৃপার টানে উচ্চ নীচ, ধনী নির্ধন শত শত লোক তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা পাইয়াছে। তিনি রাজা রাণীর দীক্ষাপ্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের প্রার্থনায় উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই এবং শেষ পর্য্যন্ত দীক্ষা দেনও নাই। তাঁহার শিষ্যগণ মধ্যে ধনী ও মানী এবং অত্যুচ্চ শিক্ষিত লোক ত ছিলই, বরং মধ্যবিত্ত ও অল্পবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত ও অল্পবিত্ত লোকই অধিক ছিল।

তাঁহার চরিত্রের এক মধুর ধর্ম্ম এই ছিল যে, তিনি অতিশয় গুণগ্রাহী ছিলেন। শিষ্য হউক, অশিষ্য হউক, গুণীর আদর করিতে তিনি কখনই ত্রুটি করিতেন না। উদাহরণ দিতে গেলে প্রবন্ধ আরও বেশী দীর্ঘ হইবে। শিষ্যদের যৎসামান্য গুণ তিনি অতি আদরের চক্ষে দেখিতেন এবং তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে কার্পণ্য করিতেন না।

বালক বালিকারা ছিল তাঁহার অতি প্রিয়। তাহাদের সঙ্গে তিনি কত হাসি কৌতুকই না করিতেন। ইহাতেও সময় সময় তাঁহার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হইত। একটি ৮।৯ বৎসরের কুমারী একদিন তাঁহাকে বলে, "বাবা, কাল রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিয়াছি আপনাকে যেন কোলে নিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে তাহাকে একটু অন্তরালে নিয়া সোলার মত হাল্‌কা হইয়া তাহার কোলে উঠেন। কিছুক্ষণ পরে সেই লঘুত্ব সংহার করিতে আরম্ভ করিলে বালিকাটি তাঁহাকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া সকলের নিকট আসিয়া সেই কথা বলে। বস্তুতঃ মাধুর্য্য যে ঐশ্বর্য্যেরই অঙ্গ একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মাধুর্য্য, সামর্থ্য, জ্ঞান, প্রেম সব নিয়াই ঐশ্বর্য্য, যাহা যোগীর বিশিষ্ট লক্ষণ বলিয়া স্বীকৃত।

শ্রীশ্রীবাবা বিশুদ্ধানন্দের সকল মাহাত্ম্যের সমুচিত বর্ণনা বা বিশ্লেষণ আমার সামর্থ্যের অতীত। আর একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার চেষ্টাও বাতুলতা মাত্র। আমি দিঙ্‌মাত্র প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিলাম। পাঠকগণ আমার অযোগ্যতা ও ধৃষ্টতা ক্ষমা করুন।

দেহ ও কর্ম

(প্রথম প্রস্তাব)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট

শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিতেন, "শরীরং কেবলং কর্ম শোকমোহাদি-বর্জিতম্।" কর্ম হইতে শরীর হয় ইহা যেমন সত্য, তদ্রূপ কর্মের জন্যই শরীর ইহাও তেমনি সত্য। শরীর ব্যতীত কর্মও হয় না, ভোগও হয় না। প্রারব্ধ কর্মের ফল ভোগ করিবার জন্য শরীর গ্রহণ করিতে হয় এবং যতদিন শরীর দ্বারা ঐ ভোগ সমাপ্ত না হয় ততদিন শরীর-ধারণ আবশ্যক হয়। ভোগ-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শরীর-পাত ঘটিয়া থাকে। জাতি, আয়ু ও ভোগ এই তিনটি প্রারব্ধের ফল। দেহ-সম্বন্ধই জাতি বা জন্ম এবং এই সম্বন্ধ-বিচ্ছেদই মৃত্যু। উভয়ের অন্তরালবর্ত্তী সময়টি উক্ত সম্বন্ধের স্থিতিকাল। উহাকেই প্রচলিত ভাষাতে আয়ু বলা হয়। সুখ ও দুঃখ, যাহা নিজের নিয়ত-বিপাক প্রাক্তন কর্মবশতঃ আপতিত হয় তাহা বিনা বিচারে ভোগ করিয়া যাইতে হয়। তবেই উহা কাটিতে পারে। নতুবা ভোগকালেও অভিনব কর্মবীজ সঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

যে দেহ দ্বারা কর্ম করা হয় তাহা কর্মদেহ, যে দেহ দ্বারা কর্মফল সুখ-দুঃখ ভোগ করা হয় তাহা ভোগদেহ, এবং যে দেহে একই সঙ্গে কর্মও হয় ভোগও হয় তাহা মিশ্রদেহ। সাধারণতঃ

কামধাতুর দেবাদির, তির্য্যগাদির, প্রেতযোনির, অসুরাদি ও নরকবাসী জীবের দেহ ভোগদেহ। মানুষের দেহ কর্মদেহ ও ভোগদেহ উভয়ই। কর্ম করিয়া অর্থাৎ পুরুষকার প্রয়োগ করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইবার যোগ্যতা একমাত্র মানুষেরই আছে—অন্য প্রাণীর সে সামর্থ্য নাই। তাই মানুষের এত গৌরব। তত্ত্ববিদ্‌গণ সেইজন্য নরদেহের এত বেশী মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব ও মহাপুরুষ-সংশ্রয়—এই তিনটিকে জীবনের দুর্লভ সম্পৎ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভক্ত রামপ্রসাদও

"মনরে, তুমি কৃষিকাজ জান না,—
এমন মানব জমিন রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলত সোনা,"

বলিয়া তাঁহার অমর সঙ্গীতে মনুষ্য-দেহেরই উৎকর্ষ খ্যাপন করিয়াছেন। এই যে 'কৃষিকাজের' কথা বলা হইয়াছে ইহারই নাম কর্ম—মানব দেহকে আশ্রয় করিয়া মনের দ্বারা ইহা সম্পন্ন করিতে হয়, তাই মানব দেহের এত মহত্ত্ব। প্রকৃতির নিয়মে ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া জীব সর্ব্বশেষে মনুষ্য-দেহই প্রাপ্ত হয়। তখন সে কর্মের অধিকারী হয় ও অধ্যাত্ম-যাত্রার পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ লাভ করে। তাই হংস গীতাতে আছে—"গুহ্যং ব্রহ্ম তদিদং বো ব্রবীমি, ন মানুষ্যাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ"। অবিবেকের বশে ভোগ-বাসনা দ্বারা চালিত মানুষ অসংযত জীবন যাপন করিয়া দীর্ঘকাল কৃত কর্মের ফলভোগের জন্য অনুরূপ ভোগদেহ প্রাপ্ত হয় এবং এইভাবে অধঃ, ঊর্দ্ধ ও মধ্যলোক ভ্রমণ

করিতে করিতে কদাচিৎ ভোগকালের অবসান মুখে ভাগ্যবশতঃ বিবেকের উদয়ে বিশুদ্ধ কর্ম করিতে সমর্থ হয়। যোগরূপ কর্মই বিশুদ্ধ কর্ম জানিতে হইবে। শুক্ল, কৃষ্ণ ও মিশ্র এই তিন প্রকার কর্ম হইতে তদনুরূপ বিভিন্ন প্রকার গতিলাভ হয়। শুক্ল কর্মই পুণ্য—যাহার ফলে দেবলোকে দেবদেহ ধারণ করিয়া বাসনানুসারে আনন্দভোগের অধিকার জন্মে। তদ্রূপ কৃষ্ণ কর্ম বা পাপের ফলে অধোলোকে গতি হয় ও দুঃখভোগ হয়। মিশ্র কর্মে মধ্যলোকে মনুষ্য-দেহ লাভ হয়। কিন্তু যতক্ষণ অশুক্ল ও অকৃষ্ণ কর্ম অনুষ্ঠিত না হয় ততক্ষণ মানব-দেহের সার্থকতা সম্পন্ন হয় না। পুণ্য বা পাপের জন্য নরদেহ গ্রহণ করা হয় নাই—পুণ্য-পাপের অতীত শুদ্ধ আত্মকর্মের জন্যই এ দেহ ধারণ করা হইয়াছে। যতদিন তাহা না হইবে ততদিন লোক লোকান্তরে ভ্রমণ করিলেও স্থূল মানবদেহের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না।

মনুষ্যদেহই কর্ম্মানুযায়িনী গতির সূত্র। এইখান হইতে ঊর্দ্ধেও যাওয়া যায়, অধঃতেও যাওয়া যায়, বিশ্বের সর্ব্বত্র যাওয়ার পথ পাওয়া যায়। আবার ভাগ্য থাকিলে এইখান হইতেই কর্ম-প্রভাবে এমন পথ পাওয়া যায় যাহা আশ্রয় করিলে আত্মজ্ঞানের বিকাশ হইয়া পূর্ণত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়।

"যোনেঃ শরীরম্"—যোনি হইতে শরীর উদ্ভূত হয়। নরযোনি শ্রেষ্ঠ যোনি—নরদেহ শ্রেষ্ঠ দেহ। এই দেহ একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ। যাহা কিছু বাহ্য জগতে আছে তাহা সবই মানুষের দেহে আছে। অতি গভীর পাতাল-রাজ্যের নিম্নস্থ গাঢ়তম অন্ধকার হইতে ঊর্দ্ধতম মহাব্যোমের পরিস্ফুট চিদালোক পর্য্যন্ত

এই দেহে বিরাজ করিতেছে—কিছুরই অভাব নাই। পৃথিবীর দেহ মাটীর দেহ, তাহা সত্য, তথাপি ইহাতে প্রকৃতির সকল তত্ত্বই নিগূঢ়ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। আত্মার বা পুরুষের ভোগ ও সেবার জন্য এবং কর্মের জন্য যাহা আবশ্যক সবই দেহে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। দেহকে ক্ষেত্র বলা হয়—কারণ মন ও প্রাণের দ্বারা ইহাকে যথাবিধি কর্ষণ করিয়া ইহাতে গুরুদত্ত বীজ বপন করিতে পারিলে ইহা হইতে কল্পবৃক্ষের উৎপত্তি হয় যাহা যথাসময়ে অমৃত ফল প্রসব করে।

চেতন ও অচেতন উভয় সত্তার সংঘর্ষে দেহ উৎপন্ন হয়। লিঙ্গ ও যোনির পরস্পর সন্নিকর্ষ হইতে ইহা জাত হয়। লিঙ্গ অলিঙ্গের চিহ্ন মাত্র। মহালিঙ্গ ও মহাযোনি মূলতঃ এক হইলেও ব্যক্তভাবে লিঙ্গে ও যোনিতে তারতম্য আছে এবং এই তারতম্য-মূলক ক্রমিক উৎকর্ষসম্পন্ন ৮৪ লক্ষ স্তর ও তদনুরূপ ৮৪ লক্ষ দেহ বিদ্যমান আছে। বিশুদ্ধ অহংভাবের বিকাশের জন্য প্রকৃতির বিশাল বিজ্ঞানশালাতে এই বিবর্ত্তনের কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। মূল অব্যক্ত সত্তা হইতে শক্তির স্পন্দনে অন্নময় সত্তার আবির্ভাব হয়। অন্নময় সত্তা হইতে প্রাণময় সত্তার বিকাশ ও প্রাণময় সত্তা হইতে মনোময় সত্তার অভিব্যক্তি এই বিবর্ত্তনের অন্তর্গত। সঙ্গে সঙ্গে দেহেরও ক্রমবিকাশ জানিতে হইবে।

মানবদেহের বিকাশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রাকৃতিক প্রেরণা হইতেই আপনা আপনি বিকাশ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। "God made Man after His own Image" যে বলা হয় তাহার তাৎপর্য্য এই যে মনুষ্যদেহই ভগবৎ স্বরূপের প্রতীক বা আভাস।

মনুষ্যত্বের পূর্ণতা হইতেই পূর্ণ ভগবত্তার অভিব্যক্তি হয়। নররূপী আধার ভিন্ন অন্য কোন আধারে অর্থাৎ পশু আদির আধারে দিব্যশক্তির আবির্ভাব সম্ভবপর নহে। অবতারাদির ব্যাপার অন্যরূপ। ভক্ত রামপ্রসাদ যাহাকে কৃষিকার্য্য বলিয়াছেন তাহা একমাত্র এই নরদেহেই সম্ভবপর হয়, কারণ এই দেহেই অহং-ভাবের প্রথম স্ফূর্ত্তি হয় এবং এই দেহেই অহং-ভাবের পূর্ণতা সিদ্ধ হয়। সমস্ত জড় ও জীব জগতের সমষ্টি-সত্তা ঘনীভূত হইয়া মানবদেহ রচিত হয়। মনের ও অহং-ভাবের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বাক্‌শক্তি বৈখরীরূপে এই দেহেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। বলা বাহুল্য, ইহাই প্রজ্ঞার বীজ। বর্ণাত্মক শব্দের ক্রিয়া এবং বর্ণাত্মক শব্দের বিলয়ন ব্যাপার উভয়ই এই দেহেই হইয়া থাকে। নাদ ও জ্যোতি যে বিন্দু হইতে ফোটে তাহার প্রথম সূচনা মানবদেহেই পাওয়া যায়। এই দেহেই বন্ধন বোধ হয় বলিয়া এই দেহেই মুক্তি সম্ভবপর। কুণ্ডলিনীর স্থিতি এই দেহেই আছে। সুষুম্না নাড়ী ও ষট্‌চক্রের অবস্থান মানবেতর যোনিতে যথাবৎ পাওয়া যায় না। ব্রহ্মচর্য্যের অভ্যাস অন্য দেহে সম্ভবপর নয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি পশু প্রভৃতিতেও হইয়া থাকে, কিন্তু তুরীয় ও তুরীয়াতীত একমাত্র মানবেই সম্ভবে। এইজন্য কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিরূপ যোগের অভ্যাসও শুধু এই মানবদেহেই হইতে পারে।

প্রকৃত দিব্যদেহ যাহা তাহা মানবদেহেরই বিকাশ মাত্র। মানবদেহই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে ভগবদ্‌দেহরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই পরিণতি-সাধনে যে উপায় অনুসৃত হয় তাহারই নাম কর্ম।

দেহে চৈতন্য ও জড় সত্তা মিলিতভাবে বিদ্যমান। মানবেতর দেহেও যেমন, মানবদেহেও ঠিক তেমনি। কিন্তু নিম্নদেহে অহং-ভাবের অবয়বরূপ রশ্মিপুঞ্জ ক্রমবিকাশের নিয়মে পরিস্ফুট হয় না। এই সকল রশ্মি দেহস্থ কমলের দলে দলে আপন স্বরূপ প্রকটিত করে। এই সকল বিকীর্ণ রশ্মিকে পৃথক্ পৃথক্ ফুটাইয়া একত্র করিতে পারিলেই জ্ঞানজ্যোতির বিকাশ হয় ও দিব্যনেত্র উন্মীলিত হয়। ষট্‌চক্রভেদের ইহাই তাৎপর্য্য। আভাস অহং ক্রমশঃ বিশুদ্ধ অহংএ পূর্ণতা লাভ করে। মানবজীবনের সফলতা তাই আত্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্তি বলিয়া জানিতে হইবে।

রশ্মিসকল মানবদেহে তেজঃ ও কায়াগ্নিরূপে জাগ্রৎ হয়। পূর্ণভাবে জাগিলে ইহারাই সম্মিলিতভাবে ঋষিগণের বর্ণিত ব্রহ্ম-বর্চসরূপে উপলব্ধ হয়। বিজ্ঞানবিৎ যোগিগণ ইহাকে তাড়িত শক্তি বা বিদ্যুৎ নামে অভিহিত করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মানবদেহে সকল তত্ত্বই বিদ্যমান আছে। আপাততঃ ৩৬ তত্ত্ব না ধরিয়া প্রচলিত ২৪, ২৫ বা ২৬ তত্ত্বই ধরা যাউক। তবে ইহাদের মধ্যে পার্থিব দেহে পৃথিবী তত্ত্বের প্রাধান্য আছে। বলা বাহুল্য, পঞ্চভূতই স্থূল দেহের উপাদান রূপে বিদ্যমান থাকিলেও পার্থিব দেহে পৃথিবীরই প্রাধান্য। পৃথিবীর অংশ অন্যান্য ভূত বা তত্ত্বের অংশের সহিত মিলিতভাবে বিদ্যমান আছে। এই মিলনের বা সংঘাতের মূলে আছে সংস্কারোপহিত শক্তিরূপী চৈতন্যের সংহনন শক্তি। চিৎ ও অচিতের মিলনেই সৃষ্টি—ইহা মনে রাখিতে হইবে। যোগী বা কর্ম্মী যখন আত্মকর্মে প্রবৃত্ত হয় তখন তাহার ক্রিয়মাণ কর্ম্মের প্রভাবে এই সংঘাতটি ভাঙ্গিয়া যায়—অবশ্য

ক্রমশঃ। ফলে চৈতন্যাংশ মুক্ত হয় ও জড়াংশ পৃথক্ হয়। এই পৃথক্‌করণটি বিবেকের ক্রিয়া।

দুগ্ধ বা দধি মন্থন করিলে যেমন মাখন উত্থিত হয়, যেমন গম ভাঙ্গিলে তাহা হইতে আটা বাহির হয়, তিল ও সর্ষপ ঘানিতে পিষিলে যেমন তৈল বাহির হয়, তদ্রূপ কর্মরূপ মন্থন-ক্রিয়ার প্রভাবে পার্থিব দেহ হইতে দেহস্থ চিদুজ্জ্বল সত্ত্বাংশ তাড়িত শক্তি রূপে পৃথক্ হয়। ক্রমশঃ জলীয় ও অন্যান্য ভৌতিক অংশ হইতেও সত্ত্বাংশ পৃথক্ হইয়া যায়। স্থূলদেহের সমস্ত সত্ত্বাংশ যতক্ষণ পৃথক্ না হয় ততক্ষণ মন্থন-ক্রিয়ার প্রয়োজন থাকে। তাহার পরে আর ঐ ক্রিয়া আবশ্যক হয় না। তিলে যে পরিমাণ তৈল নিহিত থাকে তাহার সবটুকু বাহির হইলে আর পেষণের প্রয়োজন থাকে না, কারণ অবশিষ্টাংশ তৈলহীন অসার পিণ্ড মাত্র। তদ্রূপ স্থূলদেহে যে পরিমাণ চৈতন্য শক্তি আবদ্ধ ছিল তাহার সমস্তটা মুক্ত হইলে স্থূল দেহের ক্রিয়ার অবসান স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। অনন্তকাল বিবেক-ক্রিয়া চলে না। বিবেকমূলক জ্ঞানের উদ্ভব হওয়াই কর্মের উদ্দেশ্য।

ঐ উদ্‌ভূত তেজঃ বা শক্তি স্থূল দেহের অন্তঃস্থ অপঞ্চীকৃত ভূত ও অন্যান্য তত্ত্বের অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বিগলিত করে ও স্থায়ী আকারে পরিণত করে। সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল সূক্ষ্ম দেহের অবয়ব—কিন্তু ঐ সকল তত্ত্ব হইতে স্থায়ী আকার গঠন এতদিন হয় নাই। তাই প্রকৃত সূক্ষ্মদেহ সাধকের ততদিন প্রাপ্তি ঘটে না যতদিন তাহার স্থূল দেহের কর্মের অবসান না হয়। ঐ সকল তত্ত্ব উপাদান হিসাবে প্রতি মানবেই আছে এবং নিজ নিজ কার্য্য

করিতেছে, কিন্তু স্থায়ী দেহ রূপে কার্য্য করে না। দেহরূপে উহা যখন পরিণত হয় তখন স্থূল শরীরের অভিমানী পুরুষ স্থূ অভিমান-রহিত হইয়া ঐ সূক্ষ্ম শরীরে অভিমানী হয় ও আপ ইচ্ছানুসারে স্থূল পিণ্ড ত্যাগ করিয়া বাহির হইতে পারে ফিরিতে পারে। যোগী ভিন্ন সাধারণ মানুষ ইহা পারে না। তাহ একমাত্র কারণ, স্থায়ী রচনারূপে সূক্ষ্ম শরীর তাহার নাই ও তাহা তাহার অভিমানও ক্রিয়াশীল নহে। প্রকৃতির নিয়মে ও প্রেরণা সূক্ষ্মাদি অবস্থাতে সকলেরই সূক্ষ্ম শরীরের গতি ও সঞ্চরণ দৃষ্ট হ ইহা সত্য। কিন্তু তাহা বাসনাদিবশতঃ প্রকৃতির প্রভাবেই স্বেচ্ছা...হয় না। পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহা সম্পন্ন হই স্বেচ্ছাতে যেমন স্থূল জগতে স্থূলদেহ লইয়া ব্যবহার করা য তদ্রূপ নিজের ইচ্ছা অনুসারে সূক্ষ্ম জগতেও সূক্ষ্মদেহ লইয়া কি করা যায়।

অনাত্মাতে আত্মবোধরূপ অভিমান যখন স্থূল শরীর অব করিয়া কার্য্য করে তখন এই অভিমান হইতেই স্থূল দেহের প্রসূত হয়। কিন্তু যখন পূর্ব্বলিখিত নিয়মে একদিকে স্থূল দে কর্ম সমাপ্ত হইবে ও অপরদিকে স্থায়ী সূক্ষ্ম দেহ সূক্ষ্ম স উপাদানে অভিব্যক্ত হইবে তখন ঐ অভিমান স্বভাবতঃ স্থূল ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম দেহকে আশ্রয় করিবে। তখন ঐ দেহকেই 'আমি' বলিয়া মনে হইবে ও স্থূলদেহে 'আমি' আভাস মাত্র হইয়া যাইবে। কারণ স্থূলদেহ চৈতন্যের অপগ ফলে তখন শববৎ হইবে। অভিমানশীল সূক্ষ্মদেহ তখন শববৎ স্থূল দেহকে নিজের অধীন করিয়া আসনে পরিণত করি

ইহাই প্রকৃত শবাসন—পূর্ণ যোগীর যোগ-ক্রিয়ার পরিপুষ্টির জন্য এই আসনই উপযোগী হয়। তখন স্থূল-নিরপেক্ষ অথচ শবাসনীকৃত স্থূলে অধিষ্ঠিত সূক্ষ্ম দেহে কর্ম আরম্ভ হয়।

যদি প্রারব্ধ ভোগ পূর্ব্বেই সমাপ্ত হইয়া যায় ও স্থূল দেহের কর্ম-সমাপ্তির পূর্ব্বেই স্থূল দেহের অন্ত ঘটে তাহা হইলে অবশিষ্ট কর্ম করিবার জন্য মৃত্যুর পর আবার স্থূলদেহ গ্রহণ করিতে হয়। বলা বাহুল্য, আত্মকর্মই এখানে কর্ম শব্দের লক্ষ্য। আত্মকর্ম না হইয়া অন্য কর্ম হইলে সুখ দুঃখ ভোগের জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মান্তরের আশঙ্কা থাকে। পক্ষান্তরে যদি কাহারও স্থূল কর্মের শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রারব্ধও সমাপ্ত হয় ও তাহার ফলে স্থূলদেহ ত্যাগ হয়, তাহা হইলে উহাকে শবাসনরূপে পরিণত করিবার ও তাহাকে অধিষ্ঠান করিয়া সূক্ষ্মদেহে কর্ম করিবার সুযোগ এ জীবনে ঘটে না।

স্থূল কর্ম প্রভাবে যেমন স্থূল ভৌতিক সত্তা হইতে চৈতন্যের নিষ্কর্ষ হয় ও সেই চৈতন্য-শক্তিরূপী অগ্নির তাপে সূক্ষ্ম সত্তা বিগলিত হইয়া আকার ধারণ করে ও স্থায়ীরূপে পরিণতি লাভ করে, তদ্রূপ সূক্ষ্মদেহে অভিমান উদয়ের পরে সূক্ষ্মদেহে অনুষ্ঠিত কর্মের প্রভাবে সূক্ষ্ম সত্তাতে নিহিত অবিবিক্ত চৈতন্য-শক্তির বিবেচন হয় ও সেই চৈতন্যশক্তি পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতিতে উত্থিত হইয়া কারণ সত্তাকে বিগলিত করে, যাহার ফলে কারণ সত্তা প্রকৃত কারণদেহরূপে পরিণত হয়। যতদিন সূক্ষ্ম সত্তা হইতে তন্নিহিত সমগ্র চৈতন্য বা তেজঃ সমাহৃত না হয় ততদিন সূক্ষ্ম দেহের কর্মের অবসান হয় না। মৃত্যুর পূর্ব্বে যদি সূক্ষ্ম দেহের দ্বারা অনুষ্ঠেয় আত্মকর্ম পরিসমাপ্ত হয় তাহা হইলে সূক্ষ্ম দেহটিও পুর্ব্ববৎ স্থূলের

ন্যায় শবরূপে পরিণত হয় ও অভিমান সূক্ষ্মকে ত্যাগ করিয়া কারণ দেহকে আশ্রয় করে। 'আমি'টি তখন কারণদেহকে আশ্রয় করিয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুইটি শবাসনের উপর অধিষ্ঠিত হয় ও কারণ দেহের কর্ম পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। সূক্ষ্মদেহের কর্ম এক আসনের কর্ম, কিন্তু কারণদেহের কর্ম দুই আসনের কর্ম।

কিন্তু যদি সূক্ষ্মের কর্ম পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে কারণ দেহের অনুষ্ঠেয় কর্ম অনারব্ধ থাকিয়া যায়। স্থূল দেহের কর্ম পূর্ণ না হইয়া দেহপাত হইলেও তদ্রূপ সূক্ষ্মের কর্ম অনারব্ধ থাকে। স্থূলাভিমান থাকিতে থাকিতে স্থূলকর্ম বন্ধ হইলে আবার স্থূলকে গ্রহণ করিবার জন্য মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতে হয়। কিন্তু স্থূলাভিমান নিবৃত্ত হওয়ার পর বা সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটিলে সাধারণতঃ মাতৃগর্ভে আসিবার প্রয়োজন হয় না। তখন সূক্ষ্মদেহ শবাসনে উপবিষ্ট হইয়াছে। তাই ঐ মৃত্যু প্রকৃত মৃত্যু নহে। সূক্ষ্মাভিমানী শবীভূত স্থূলে উপবিষ্ট যোগী তথাকথিত মৃত্যুর পরেও আসন ত্যাগ করে না—সূক্ষ্ম শরীরে থাকিয়া সে কার্য্য করিতেই থাকে। তাহার কর্মে বাধা হয় না। তবে জীবিত অবস্থাতে থাকিয়া কর্ম করিতে পারিলে কর্ম সমাপ্ত হয় অল্প সময়ে—কারণ ঐ কর্ম কালের কর্ম। উহা ক্ষিপ্র গতিতে অগ্রসর হয়। কিন্তু স্থূল কর্ম সমাপ্ত না করিয়া মৃত্যু ঘটিলে শবাসন লাভ হয় না বলিয়া পুনরায় মাতৃগর্ভে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হয়। অন্য কোন উপায় নাই। অন্ততঃ একটি শবাসন লাভ করিতে পারিলেও যোগী আসনে বসিতে পারে বলিয়া গর্ভযন্ত্রণা ও কালরাজ্যে প্রবেশের উপদ্রব হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে। মৃত্যুর

ভিতর দিয়াই অমরত্বের মার্গ রহিয়াছে জানিতে হইবে। পশুর মৃত্যুতে অমরত্ব আসে না—পশু "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি," পুনঃ পুনঃ জঠর-যন্ত্রণা ভোগ তাহার পক্ষে অনিবার্য্য। কিন্তু স্থূলদেহের আবশ্যকীয় কর্ম পূর্ণ করিতে পারিলে ও স্থূলদেহকে শবরূপে আসন করিয়া নিজে তাহাতে অধিষ্ঠিত হইতে পারিলে জন্ম-মৃত্যু বর্জিত হইয়া যায়। কিন্তু কর্মের পূর্ণতা হয় নাই বলিয়া কর্ম বর্জিত হয় না, মহাজ্ঞানও আসে না। আপেক্ষিক খণ্ড জ্ঞান অবশ্য আসে।

প্রশ্ন হইতে পারে—যোগী তখন কোথায় ও কি ভাবে থাকিয়া কর্মের ক্রমিক বিকাশ সম্পন্ন করেন? এই প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা বারান্তরে করিতে চেষ্টা করিব ইচ্ছা রহিল। তবে এই স্থানে ইহাই বলিয়া রাখি যে আত্মকর্মের গতিরোধ হয় না ও একবার শবাসন প্রাপ্ত হইলে জন্ম-মৃত্যুর অতীত, কালের অতীত, নির্মল ভূমিতে যোগী আত্মকর্ম পূর্ণ করিতে থাকেন। তবে ঐ কর্ম পূর্ণ করিতে সময় অধিক লাগে। কালের রাজ্যে বিকাশ যত দ্রুত হয় অমর দেহে তত দ্রুত হইবার সম্ভাবনা নাই।

যাহা হউক, আমাদের লক্ষ্য বর্ত্তমান জীবনে কর্ম সমাপ্ত করা ও অভিনব অনন্ত কর্মের ধারাতে প্রবেশ করা। প্রকৃতি হইতে পুরুষকে পৃথক্ করিয়া প্রকৃতি-জন্য কারণদেহ পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিতে না পারিলে এই মহালক্ষ্যে উপনীত হইবার আশা নাই। অভিমান কারণদেহকে আশ্রয় করিয়া কারণদেহে কর্মের সূচনা করে। সূক্ষ্মের কর্ম শেষ হওয়ার পর ও সূক্ষ্মদেহ শবাসন হইয়া কারণে অধিষ্ঠিত হওয়ার

পর যোগী কারণদেহকেই আশ্রয় করিয়া **আমি** বলিয়া নিজেকে অনুভব করেন। আত্মকর্ম চলিতেই থাকে এবং কারণ সত্তা বা মূল প্রকৃতিতে নিহিত গুপ্ত চৈতন্য বিবিক্ত হইতে থাকে। যখন প্রকৃতি-রূপা কারণ সত্তা হইতে চিৎশক্তি বিবিক্ত হয় তখন যোগীকে একটি অনির্বচনীয় স্থিতির সম্মুখীন হইতে হয়। এই অবস্থাতেই জীবাত্মা বা পুরুষের স্বরূপ-জ্ঞান জাগে। পুরুষ যে চতুর্বিংশতি তত্ত্বময়ী প্রকৃতি হইতে বিবিক্ত তাহা তখন স্বচক্ষে দর্শন হয়। এই সময় যদি পরমেশ্বরের মহাকৃপা লাভ না ঘটে তাহা হইলে পুরুষ এই স্বরূপ-জ্ঞানে প্রকাশমান নিজ সত্তাতে স্থিত হয় ও কৈবল্য লাভ করে। মায়াতেও প্রায় এই জাতীয় অবস্থারই উদয় হয়। দুই আসনের ক্রিয়ার ফলে এই পর্য্যন্ত সিদ্ধি ঘটে।

কিন্তু ইহাকে আমি মহাসিদ্ধি বলি না—যদিও ইহাও কম নহে। প্রকৃতি হইতে পৃথক্ হইলেই ত চলিবে না—প্রকৃতিকেও, ঠিক প্রকৃতিকে নহে কিন্তু কারণ দেহকেও, আসন করিতে হইবে। তাহা না করিতে পারিলে প্রকৃতি-মুক্ত পুরুষের কৈবল্যই প্রাপ্তি।

কারণদেহকে আসন করিতে হইলে অভিমানকে বিসর্জ্জন না করিয়া জাগাইয়া রাখিতে হয়। এক হিসাবে দেখিতে গেলে অভিমানের পূর্ণাহুতির সময় আসিয়াছে,—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, তিন দেহ রচিত হইয়াছে, তিন দেহেই অভিমান সমভাবে কার্য্য করিয়াছে, ফলে তিন দেহেরই কর্ম সমাপ্ত হইয়াছে। তাই প্রকৃতির কর্ম সমাপ্ত হইয়াছে এবং চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সহিত সঙ্কীর্ণভাবে অবস্থিত বদ্ধ চিৎসত্তা মুক্ত হইয়া স্বয়ং পুরুষরূপে

আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—সুতরাং কর্ম্মের ফলে জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান উদিত হইয়াছে। এখন কৈবল্য স্বতঃপ্রাপ্ত—আর তাহাতে অভিমানের স্থান নাই, প্রয়োজনও নাই। কারণ, করণীয় কর্মও আর অবশিষ্ট নাই। তাই ইহাই অভিমানের পূর্ণাহুতির সময়।

কিন্তু মহাযোগী এখানেও শেষ দেখেন না। পূর্ণাহুতি অভিমানের হয় বটে, কিন্তু অগ্নি নির্ব্বাণ হয় না। অথবা নির্ব্বাণের মধ্যেও অনির্ব্বাণ অগ্নি জাগাইয়া রাখা হয়—তদ্রূপ অভিমান সমাপ্ত হইলেও একটি বিশুদ্ধ অভিমানরূপে তাহাকে রাখা হয়। কারণ, মহাকর্ম ত বাকী আছে।

অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপী নির্মল সত্তাতে ঐ অভিমানের যোগ হয়। বলা বাহুল্য, পুরুষ এখন পরমপুরুষ বা মহাপুরুষপদে অভিষিক্ত। প্রকৃতির কর্ম শেষ করিয়া তিনটি শবাসনের উপরে আসীন হইয়া যোগী বিশুদ্ধ সত্ত্বময় আধারে স্থিত হইয়াছেন। ঐ আধারটি তখন মহাকারণদেহরূপী জানিতে হইবে। এইটি যোগীর বিশুদ্ধ অভিমান বা আমিত্ব। এই আসনে আসীন হইয়াই যোগী বিশ্বকর্মের মহাক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হন।

তখন তাঁহার ব্যক্তিগত প্রয়োজন থাকে না—সমস্ত জীব জগতের প্রয়োজনই তখন তাঁহার প্রয়োজন। ভগবান্ ব্যাসদেব যোগসূত্রের ভাষ্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"তস্য আত্মানুগ্রহাভাবেঽপি ভূতানুগ্রহ এব প্রয়োজনম্"। তাঁহার একমাত্র প্রয়োজন ভূতানুগ্রহ—জীবের কল্যাণ সাধন,—অন্য কোন প্রয়োজন তাঁহার নাই। যোগীও তখন বিশুদ্ধসত্ত্বময় আধারে স্থিত হইয়া ভূতানুগ্রহ বা জীবসেবাতে নিরত হন। ইহাই পরার্থ কর্ম।

গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন—"উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম চেদহম্"—ইহা সেই জাতীয় কর্ম।

এইখানে একটি গভীর রহস্যের কথা বলা আবশ্যক। মনুষ্য জীবিত অবস্থায় যদি এই ভূমি পর্য্যন্ত উত্থিত হইতে পারে, অর্থাৎ তিন আসনের কর্ম সম্পন্ন করিতে পারে অথবা প্রকৃতির চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হইতে চৈতন্য সত্তাকে পৃথক্ করিয়া প্রকৃতিকে ও মায়াকে স্বায়ত্ত করিয়া বিশুদ্ধ অভিমান সহকারে মহামায়ার মুক্তক্ষেত্রে আধিকারিক পুরুষরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রভাব বিশ্বসংসার অনুভব করিয়া ধন্য হয়। তাহার প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত দেহ তখন এক হয়—উহাই মহাসিদ্ধদেহ নামে পরিচিত হয়।

প্রকৃতির বিজ্ঞানশালাতে এই বিরাট্ অনুষ্ঠানের আয়োজন চলিতেছে। বাহ্য জগৎ তাহার কোনও সন্ধান রাখে না, রাখিতে পারেও না।

আমরা যাহাকে মৃত্যু বলিয়া থাকি তাহা অনেক নীচের ব্যাপার। কিন্তু নীচের হইলেও তাহা অপরিহার্য্য। স্থূলদেহ হইতে মানবের সূক্ষ্ম সত্তা পৃথক্ হইলেই আমরা তাহাকে মৃত্যু বলিয়া বর্ণনা করি। কিন্তু যদি স্থূলের কর্ম অর্থাৎ স্থূল যোগ্য আত্মকর্ম সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে এই ঘটনা ঘটে তাহা হইলে জীবকে অবশিষ্ট আত্মকর্ম করিবার জন্য পুনরায় স্থূলদেহ গ্রহণ করিতে হয় বা জন্ম নিতে হয়। যতদিন আত্মকর্ম পূর্ণ না হইবে ততদিন এইরূপই চলিবে। কারণ স্থূল মানব দেহ ধারণ ব্যতীত আত্মকর্ম করার উপায় নাই। অজ্ঞানজ কর্মের ফলে যদি শুদ্ধ বা মলিন ভোগদেহের

প্রাপ্তি ঘটে তবে উহা কালক্ষেপ জানিতে হইবে। কারণ মানবদেহ হইতে একবার চ্যুত হওয়াও অত্যন্ত দুর্ভাগ্য—যে হেতু উহা ক্রম-বিকাশের পথে মহা অন্তরায়। মানবদেহে শুধু প্রারব্ধ ভোগ না হইয়া যদি অজ্ঞানবশে নবীন কর্ম উদ্ভূত হয় তাহা হইলেও উহা সঞ্চিত কর্মের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয় এবং উহা নিয়ত-বিপাক হইলে ও ভাবী প্রারব্ধের রচনাতে অঙ্গীভূত হইলে বিপচ্যমান হইয়া অনুরূপ সুখ-দুঃখরূপ ভোগ দানের জন্য ব্যাপৃত হয়। ইহা কর্ম-জগতের দৈনন্দিন ব্যাপার। ইহার আলোচনা এই স্থলে অপ্রাসঙ্গিক।

যদি স্থূলের আত্মকর্ম পূর্ণ হয়, কিন্তু তৎক্ষণেই প্রারব্ধ ভোগও পূর্ণ হয় বলিয়া মৃত্যু ঘটে এবং ঐ অবস্থাতে স্থূল দেহকে শবাসন করিবার অবসর না পাওয়া যায় তাহা হইলে খাঁটি সূক্ষ্ম শরীর রচিত হইয়াছে (স্থূলের আত্মকর্ম দ্বারা) বলিয়া মানুষ ভৌতিক সত্তার উর্দ্ধে কৈবল্য লাভ করে। তাহাকে আর ভৌতিক জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। কিন্তু তখন এই অসুবিধা থাকে যে আসন প্রাপ্তির অভাবে পরলোকে নিরালম্ব অবস্থা হয় বলিয়া নিষ্ক্রিয় ভাব থাকে—সূক্ষ্মদেহোপযোগী আত্মকর্মের সূত্রপাত হয় না। কৈবল্য হইলেও ইহা ঠিক কৈবল্য নহে, কারণ লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম দেহ বিদ্যমান থাকে—শুধু কর্ম করিতে পারে না মাত্র। সে স্থূল জগতে আসে না—তাই সে এক হিসাবে মৃত্যু-বর্জিত। কিন্তু তাহারও ভাবী মৃত্যু আছে। কারণ সূক্ষ্মদেহ যখন আছে তখন তাহার কর্মও কখন না কখন করিতেই হইবে এবং পরে তাহারও বর্জন হইবে (যদি দ্বিতীয় শবাসন করিতে না পারা যায়)। সূক্ষ্মদেহের মৃত্যুও মৃত্যু বটে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে স্থূলের আত্মকর্ম সমাপ্ত ও প্রারব্ধভোগ সমাপ্ত হওয়ার পর অভিমান সূক্ষ্মে যোজিত হইয়া স্থূলকে শবরূপী আসনে পরিণত করিতে পারিলে ঐ পূর্ব্বোক্ত নিরালম্ব অবস্থার নিষ্ক্রিয়ত্ব ঘটে না। কারণ তখন আসন লাভ হইয়াছে ও কর্ম আরব্ধ হইয়াছে। ইহারই জন্য অমল ভূমির দ্বার মুক্ত হয়—সেখানে কর্মের ক্রমোন্নতি ঘটে। তবে তাহা দীর্ঘকালের ব্যাপার। কারণ কালের প্রভাবের বাহিরে অমর জগতে কর্ম ক্ষিপ্র গতিতে অগ্রসর হয় না।

স্থূল শরীর সাধারণতঃ প্রারব্ধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রারব্ধ অতি জটিল তত্ত্ব—বারান্তরে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অবসর নিবার ইচ্ছা আছে। কর্ম, অনুগ্রহ, সংস্কার (প্রাক্তন) প্রভৃতি বহু বিভিন্ন শক্তির একত্র সংঘটনে প্রারব্ধ রচিত হয় এবং ইচ্ছার উৎকটতা হইতে উহার সৃষ্টি হয়। তাই এক দৃষ্টিতে আয়ু নিয়ত বলিয়া অকাল মৃত্যু নাই—ইহা সত্য। আবার আয়ুর বৃদ্ধি-হ্রাস উভয়ই সম্ভবপর—ইহাও সত্য। এই বৃদ্ধি-হ্রাস শক্তির সংযমের বা অপচয়ের ফলে হইতে পারে—অথবা বাহির হইতে শক্তির অনুপ্রবেশাদি কারণ হইতেও হইতে পারে।

যে কোন কারণেই হউক এই দেহটি বজায় থাকিতে থাকিতেই যোগী নিজের সমস্ত আত্মকর্ম সমাপ্ত করিতে ইচ্ছা করেন। এই দেহে থাকিতেই যদি ভৌতিক দেহকে শব করিয়া নিজে সূক্ষ্ম শরীরে—তাহা আভাসময় ভাবদেহই হোক বা জ্ঞানদেহই হোক—অভিমান করিয়া সূক্ষ্মের আত্মকর্ম করা যায় তাহা হইলে এই দেহে থাকিয়াও অমল ভূমিতে অবস্থান করা যায়। তবে নিম্নস্তরে।

জ্ঞানগঞ্জের তত্ত্ব আলোচনা-প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে নিজের অনুভব ও বোধ অনুসারে অমল ভূমির রহস্যের সম্মুখীন হইতে চেষ্টা করিব। গুপ্ত রহস্যের উদ্‌ঘাটন ব্যক্ত জগতে অসম্ভব। তবে অধিকারিগণের কৃপা হইলে কাহারও কাহারও ভিতরে মহালোকের ক্রিয়াতে কিছু কিছু প্রকাশের খেলাও ঘটিতে পারে।

লৌকিক-অলৌকিক

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব, ডি, এস-সি

(১)

বর্ত্তমান বৎসর (সন ১৩৬০) এক হিসাবে খুব সুবৎসর। আমার গণনা অনুসারে এই বৎসরেই শ্রীশ্রীবাবার এক শত বর্ষ পূর্ণ হইল। আমার মতে তাঁহার জন্ম সন ১২৬০, ২৯শে ফাল্গুন। এই বৎসরটি তাঁহার জন্ম বৎসর ধরিলে অনেক কিছুই বেশ ভাল ভাবে মিলিয়া যায়। শ্রীযুক্ত অক্ষয় দাদা তাঁহার বহিতে যে জন্ম বৎসর নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন—অর্থাৎ ১২৬২ সাল—তাহা একাধিক কারণে ঠিক বলিয়া মনে হয় না। শ্রীশ্রীবাবার জন্ম বৎসর কি তাহা নির্দ্ধারণ করা খুব কঠিন নয়। ঐ বৎসর কয়েক মাস পূর্বে তাঁহার পিতৃদেব পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কাজে কাজেই একটু চেষ্টা করিলে ঐ বৎসরটির সঠিক উদ্ধার হইতে পারিবে।

আর একটি তারিখ সম্বন্ধে এইখানে একটু আলোচনা করিতেছি। তাহা হইল গুষ্করায় তাঁহার আগমনের সময়। পরলোকগত যজ্ঞেশ্বর চোঙ্গদার মহাশয়ের সহিত এ সম্বন্ধে আমার কিছু আলোচনা হইয়াছিল। ইহার ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়া এই আলোচনাটির সারাংশ এখানে দিতেছি। শ্রীশ্রীবাবা যেদিন প্রথমে গুষ্করায় আসেন—সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার দেখা হয় যজ্ঞেশ্বর চোঙ্গদার মহাশয়ের সঙ্গে। ষ্টেশন হইতে নামিয়া তিনি

চোঙ্গদারদের বাটীতে যাইতেছিলেন। পথে একটি শিশু বালককে দেখিয়া ঐ বাটী কোন্ দিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এই শিশুটিই হইলেন যজ্ঞেশ্বর চোঙ্গদার। যজ্ঞেশ্বর তাঁহাকে পথ দেখাইয়া তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া যান। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—তখন আপনার বয়স কত ছিল। তিনি উত্তর করিয়াছিলেন—দশ বৎসর। যজ্ঞেশ্বর চোঙ্গদারের জন্ম হইয়াছিল ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে (এইটি অসমর্থিত)। কাজে কাজেই ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীবাবা গুষ্করায় আগমন করিয়াছিলেন। যজ্ঞেশ্বর চোঙ্গদারের নিকট অনেকগুলি কথার মধ্যে এই একটি কথা শুনিয়াছিলাম যে শ্রীশ্রীবাবার বিবাহ হইয়াছিল তাঁহার গুষ্করা থাকা কালে। যজ্ঞেশ্বর চোঙ্গদার মহাশয় নাকি বরযাত্রী হইয়া সঙ্গে গিয়াছিলেন।

গুষ্করায় আসিবার বোধ হয় বছর দুই আগে শ্রীশ্রীবাবা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন তাঁহার বয়স বোধ হয় ৩৫ বছর ছিল। এইটি শ্রীযুক্ত অক্ষয় দাদা মোটামুটি ঠিক ধরিয়াছেন। গুষ্করায় শ্রীশ্রীবাবা বিশ বছর বাস করিয়াছিলেন। ১৯১১ সালে যদি গুষ্করা ত্যাগ করিয়া থাকেন তবে তাঁহার গুষ্করার আগমন ১৮৯০ সালেই হওয়া উচিত।

এই বৎসর তাই এক হিসাবে আমাদের পক্ষে খুব সুবৎসর। শ্রীশ্রীবাবা এই মর্ত্ত্যধামে আসিবার পর এই বৎসর এক শতাব্দী পূর্ণ হইল। এই বৎসর একটি ভাল করিয়া উৎসব করিলে খুব ভাল হইত। আমরা উৎসব না করিলেও উৎসব যে হইবে না তাহা নহে—খুব ভাল করিয়াই হইবে। কোন কোন ভাগ্যবান্ তাহা দেখিবার সৌভাগ্যও লাভ করিবেন বলিয়া মনে করি।

(২)

শ্রীশ্রীবাবার জীবনটি ছিল লৌকিক ও অলৌকিক ব্যাপারে পরিপূর্ণ। অতি শিশু অবস্থা হইতেই অলৌকিক ব্যাপার তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া ঘটিতে দেখা গিয়াছে। কোনও কোনও ঘটনা এত অদ্ভুত রকম অলৌকিক যে আশ্চর্য্য হইতে হয়—অবিশ্বাস হয় যে তাহা কিভাবে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহাকে নূতন কাপড় দেওয়া হইল। তিনি শিশু-সুলভ চাপল্য বশতঃ তাহাকে ফালি ফালি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তাহার পর যখন তাড়িত হইলেন তখন সে বস্ত্রখণ্ডগুলিকে একমুঠা করিয়া ধরিয়া ছাড়িয়া দিলেন। দেখা গেল যে কাপড়টা যেমন আস্ত ছিল তেমনিই আবার আস্ত হইয়া গিয়াছে। এইরূপ ঘটনা তাঁহার শিশু অবস্থা হইতেই সংঘটিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা যেন তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক অবস্থার মত ছিল। ইহার জন্য তাঁহাকে কিছুমাত্র আয়াস স্বীকার করিতে হইত না। সাধনা করিয়া ইহাকে লাভ করিবার চেষ্টা তাঁহাকে করিতে হয় নাই। বরং হয়ত পরবর্ত্তিকালে চেষ্টা করিয়া ইহার প্রকাশ নিরুদ্ধ করিতেই হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়—তাঁহার প্রতি কাজেই অলৌকিক এত বেশী পরিমাণ আবির্ভূত হইত যে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা দায় হইত। খুব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যদি বোকার মত আচরণ করিতে চেষ্টা করে তবে সেই বোকামীও ঠিক বোকামী হয় না—অতিরিক্ত বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দেয়। ইহাও যেন কতকটা সেইরূপ। লৌকিক ও অলৌকিকে এইরূপ সংমিশ্রণ অন্য কাহারও জীবনে এত সহজভাবে মিশিয়া যাইতে বড় একটা দেখা যায় না।

(৩)

এই লৌকিক ও অলৌকিক এর ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত জীবনটির মধ্যে যে কয়েকটি প্রধান পরিবর্ত্তন দেখা যায় তা আপাতদৃষ্টিতে একটি অতিশয় অশুভ লৌকিক ঘটনা অবলম্বন করিয়াই ঘটিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই জীবনটির মধ্যে সত্যকারের conscious আধ্যাত্মিক চেতনার আরম্ভ হয় এক ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনের ভিতর দিয়া। যে সালে তিনি দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করেন ক্ষেপা কুকুর তাঁহাকে সেই বৎসরই দংশন করে। ১২৭১ সালে রচিত—গীত-রত্নাবলীতে সংগৃহীত—প্রথম গানটিতে এই আধ্যাত্মিক সূচনার ইঙ্গিত স্পষ্ট রহিয়াছে। এই গানগুলি কুকুরে কামড়াইবার পর রচিত হইয়াছিল বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। পূজ্যপাদ নীমানন্দ পরমহংস তাঁহাকে আরোগ্য করিবার অছিলায় একটি মন্ত্র দিয়া যান। তাহা এই কুকুরে কামড়াইবার দুর্ঘটনাকে অবলম্বন করিয়াই হইয়াছিল। বার বৎসর বয়সে এইভাবে আধ্যাত্মিক জীবনের বাহ্যিক সূত্রপাত হইয়া তীর্থস্বামিত্ব লাভ করেন সম্ভবতঃ ৩৮ বৎসর বয়সে—তাহার ২৫।২৬ বৎসর পরে। তখন তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন। দারপরিগ্রহের পরীক্ষায় সফল হইয়াছেন। সন্ন্যাসীর জীবনের বড় ট্রাজেডী সংসারকে স্বীকার করা—তাঁহাকে তাহা করান হইয়াছে। বিবাহের পরই আবার তাঁহাকে একটি জাতসাপ দংশন করে। (পরে ইহা বিস্তারিতভাবে বলিতেছি।) অন্য কেহ হইলে পরিত্রাণ লাভ সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। কিন্তু তখনও তিনি পরমহংস হন নাই। তিনি পরমহংস পদ প্রাপ্ত হন ১৯১০

সালে অর্থাৎ তাঁহার ৫৬ বৎসর বয়সে ও পরমপূজ্যপাদ মহাতপা মহারাজের তাঁহাকে দীক্ষাদানের প্রায় ৪২ বৎসর পরে। এই সময় তাঁহার ২০ বৎসরের কর্ম্মস্থল গুষ্করা তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু এখনও অধ্যাত্ম-জীবনের সাধনার কিছু বাকী ছিল। ১৯১৪ সালে * পূজ্যপাদ অভয়ানন্দ তাঁহাকে চিঠিতে জানাইয়াছিলেন যে তখনও আরও চারি বৎসর রহিয়াছে তাঁহার ক্রিয়া পূর্ণ হইতে। ১৯১৯ সালে দেখিতে পাই তাঁহার লৌকিক জীবনের কি প্রচণ্ড তুর্বৎসর! ঐ বৎসর তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর দেহান্ত হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সংসারে যেন মড়ক আসিয়া লাগে। ইচ্ছা করিলেই ইহার প্রতিকার করা তাঁহার করায়ত্ত ছিল। কিন্তু প্রতিকার করার প্রয়োজন তাঁহার ছিল না। যাহা ঘটিবার ঘটিল। তাঁহাকে বলা হইয়াছিল প্রতিকারের বিষয়, কিন্তু তাহা তিনি কানেও স্থান দিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। শেষ সমাপ্তির পরীক্ষায় তাঁহার অটল দৃঢ়তা অতিশয় লৌকিকভাবে হইলেও সেইরূপই অলৌকিকত্বের সূচনা করে। তাঁহার দীক্ষাপ্রাপ্তির ৫১ বৎসরে তাঁহার "ক্রিয়ার" সমাপ্তি হইল। শ্রীশ্রীবাবার জীবনে তাই ১২ বৎসর, ৩৮ বৎসর, ৪২ বৎসর ও ৫১ বৎসর লৌকিক দৃষ্টিতে যেমন অশুভ, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তেমনই শুভ।

* শ্রীমৎ অভয়ানন্দ পরমহংস দেবের মূল পত্রখানা আমার নিকট আছে। ইহাতে কোন সন তারিখের উল্লেখ নাই। সুতরাং ইহা যে ১৯১৪ সালে লিখিত তাহা বলা চলে না। আমার মতে এই পত্রখানা ১৯০৬ সালে লিখিত। যে ৪ বৎসরের কথা উহাতে বলা হইয়াছে তাহা শ্রীগুরুদেবের পরমহংসপদপ্রাপ্তি লক্ষ্য করিয়া মনে হয়। —সম্পাদক

তাঁহার জন্ম-কুণ্ডলী আমি দেখি নাই। ছিল বলিয়া জানি, কারণ বাল্যকালেই তাঁহার জন্ম-কুণ্ডলী বিচারে জানা গিয়াছিল যে তাহাতে তাঁহার পরমায়ু মাত্র ২২ বৎসর রহিয়াছে। এই কুণ্ডলীতে এই বৎসর গুলির সময় কোন্ কোন্ গ্রহের অশুভ প্রভাব ছিল তাহার বিচার করা একটি ভাল অবসর-বিনোদনের ব্যাপার হইবে সন্দেহ নাই।

এইখানে আমাদের জন্য অনেকগুলি ভাবিবার বিষয় রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীশ্রীবাবার জীবনটি আমাদের কি পরিমাণে শিক্ষণীয় বিষয় তাহা আমরা অল্পই অনুধাবন করি। জ্ঞানগঞ্জের পরমহংসগণের চিঠিতে তাঁহার অতিশয় উগ্র সাধনার কথা বার বার উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই উগ্র সাধনা করিয়াও ৫০ বৎসরেরও অধিক লাগিয়াছিল তাঁহার "ক্রিয়ার" সমাপ্তিতে। তাহা ছাড়া কোথাও তাঁহাকে উতলা হইতে দেখা যায় নাই। বরং সব সময়েই তিনি অত্যন্ত নির্ভরতার ভাব লইয়া, যেন আত্ম-সমাহিত হইয়াই, থাকিতেন। শ্রীশ্রীবাবা যখনই কাহাকেও কোনও চিঠি দিতেন একটি কথা সেখানে প্রায়ই থাকিত—"কোনও বিষয়ে কিছু চিন্তা করিবে না। যে ক্রিয়া দিয়াছি সাধ্য মত তাহা করিতে চেষ্টা করিবে। সময়ে আপনিই সব ঠিক হইয়া যাইবে।" এই উপদেশটি তিনি তাঁহার নিজ জীবনে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াই এমন অক্লান্তভাবে বিতরণ করিতেন বলিয়া মনে করি।

(৪)

শ্রীশ্রীবাবার বয়স তখন ছয়, সাত কি আট বৎসর হইবে। জ্ঞানগঞ্জের ও মনোহর তীর্থের পরমহংসগণের দৃষ্টি তখনই তাঁহার

উপর পতিত হইয়াছিল। তাঁহাকে "অপহরণ" করিবার ফন্দি বোধ হয় তখন হইতেই তাঁহারা আটিতেছিলেন। পরমপূজ্যপাদ জ্যাঠাগুরুদেব শ্রীমৎ অভয়ানন্দজী বণ্ডুলের শ্মশান-ভূমিতে আসিয়া আসন লইয়া বসিলেন। ভাবটি কিন্তু ধরিলেন অতিশয় উগ্র। যে কেহ নিকটে যাইত তাহার প্রতি ক্ষেপিয়া হুলস্থূল বাধাইতেন। তাঁহার ক্ষিপ্ত ভাব নিকটস্থ শিশু ও বালকদের কৌতূহলের কারণ হইল, কিন্তু ক্ষেপা সন্ন্যাসীটি যেন বালকদের প্রতি আরও বেশী উগ্রভাব ধারণ করিলেন। তাই কাহারও তাঁহার কাছে ঘেসিবার সাহস হইল না।

প্রায় দুই মাইল দূরে বণ্ডুলে বালক মহলে রটিয়া গেল যে শ্মশানে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছে—সে অতিশয় ভীষণ আর তাহার কাছে কেহ যাইতে সাহস পায় না, সে মারিতে দৌড়ায় ও ভীষণ গালাগালি দেয়। ইহা শুনিয়াই বালকদলের একটি বলিয়া উঠিল "আমি যাইব।" সঙ্গীদল তাহাকে বার বার নিষেধ করিল, কিন্তু এই বালকটি তাহার সঙ্কল্প ছাড়িতে রাজী হইল না। তবে বলিল যে তাদের মধ্যে কেউ যদি সাহস ক'রে তার সঙ্গে যাইতে পারে ত যাবে। শেষ পর্য্যন্ত দুইজন অপর বালকও এই বালকটির সঙ্গে যাইতে রাজী হইল। ঠিক হইল যে দুই তিন দিন পরে তাহারা যাইবে এবং রাত্রিকালে যাইবে।

যাওয়া স্থির করিয়া বালকটি এক আনা খরচ করিয়া একটি বড় কাঁঠাল সংগ্রহ করিল। শ্রীশ্রীবাবা গল্প করিতে করিতে কাঁঠালটিরও বর্ণনা দিয়াছেন। সেটি ছিল একটি খুব বড় কাঁঠাল এবং সুপক্ক। একজন লোকের পক্ষে সেটিকে তুলিতে পারা শক্ত

ছিল। শ্রীশ্রীবাবা অত অল্প বয়সেও অতিশয় শক্তিশালী ছিলেন এবং এই অর্দ্ধমন ওজনের কাঁঠাল অবলীলাক্রমে বহন করিবার সামর্থ্য রাখিতেন। এই কাঁঠালটি কিনিয়া তিনি তাঁহাদের গোয়াল ঘরের চালায় সন্তর্পণে লুকাইয়া রাখিলেন। পাকা কাঁঠালের সময় ছিল বলিয়া সে সময়টা বোধ হয় গ্রীষ্মকাল ছিল বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক, যাওয়ার সব ব্যবস্থা করিয়া সঙ্গী দুইটির সঙ্গে যাওয়ার সময় ঠিক করিয়া শ্মশানে সন্ন্যাসী দর্শনের জন্য সময়ের বা রাত্রির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সে দিন আবার শ্রীশ্রীবাবার মাতাঠাকুরাণী যেন ঘুমাইতেই চাহেন না। শ্রীশ্রীবাবা বিছানায় শয়ান—চক্ষে ঘুম নাই। মাতা-ঠাকুরাণী নানান্ কাজে বিছানায় শুইতে আসিতেছেন না। বাবা মাঝে মাঝে ডাকিতেছেন—"মা এস—না এলে আমি ঘুমাইব না।" মা আর যেন আসেন না। অবশেষে যখন মা আসিলেন—তিনি ঘুমাইতেও যেন চান না। শ্রীশ্রীবাবার পরিচর্য্যা করিতেই সময় কাটিতেছে। এদিকে শ্রীশ্রীবাবা মনে করিতেছেন—কতক্ষণে মা শুইবেন ও ঘুমে জড়াইয়া পড়িবেন। যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত মা'ত ঘুমাইয়া পড়িলেন। আর তাঁহার দুর্দ্দান্ত সন্তানটি সন্তর্পণে উঠিয়া গোয়াল ঘরের দিকে চলিলেন। অন্ধকারেই চালা হইতে প্রকাণ্ড কাঁঠালটি নামাইলেন ও সঙ্গী দুইটির জন্য পথে গিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তাহাদের কেহই আর আসিল না। তখন শ্রীশ্রীবাবা একাকীই রওয়ানা হইলেন।

প্রায় দুই মাইল গ্রাম্য বন্ধুর পথ একাকী পদব্রজে অতিক্রান্ত করিবার পর বগুলের শ্মশানভূমি দৃষ্টিগোচর হইল। আর দৃষ্টি-

গোচর হইল একটি জ্বলন্ত আগুনের পিণ্ড। তিনি দূর হইতে লক্ষ্য করিলেন যে একটি গাছের নীচে যেন একটা প্রকাণ্ড আগুন জ্বলিতেছে। যে বালক গভীর রাত্রিকালে এইভাবে শ্মশানে একাকী আসিতে সাহস পায় এই আগুন দেখিয়া তাহার কি ভয় হইবে? সাধারণতঃ একলক্ষ বালকের মধ্যে একটিও হয় ত এইভাবে শ্মশানে আসিতে গেলে রাস্তার মধ্যেই ভয় পাইয়া না পলাইয়া থাকিতে পারিবে না। তিনি আরও নিকটবর্ত্তী হইতে গেলে দেখিলেন যে সে আগুনটি প্রকৃত আগুন নহে, একটি মানুষের গা হইতে তাহা বাহির হইতেছে। ইহা দেখিয়াই তিনি স্থির করিলেন যে ইনিই বোধ করি সেই সন্ন্যাসী হইবেন। তিনি আরও আগাইয়া গেলেন।

এদিকে সন্ন্যাসীটি এই ছেলেটিকে আসিতে দেখিয়া নিজ রুদ্র মূর্ত্তি ধরিলেন। উচ্চ স্বর ও বড় বড় দুইটি পাথর লইয়া তাঁহার দিকে তাড়া করিয়া আসিলেন। শ্রীশ্রীবাবা তখন তাড়াতাড়ি কাঁঠালটি মাটিতে রাখিয়া একটি বড় বাঁশ এদিক্ ওদিক্ হইতে সংগ্রহ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন যে এ যদি আমাকে মারিতে আসে তবে এই বাঁশ দিয়া তাহা আমি নিরুদ্ধ করিব। উচ্চৈঃস্বরে সন্ন্যাসীটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি কেন এইরূপ খারাপ ব্যবহার করিতেছ?" সন্ন্যাসীটি ছেলেটির এইরূপ বাঁশ লইয়া রুখিয়া উঠিতে দেখিয়া যেন একটু শান্ত ভাব লইল এবং বাবাকে বাঁশটি ফেলিয়া দিতে বলিল। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন—"তা' হলে তুমি তোমার হাতের পাথরগুলি ফেলিয়া দাও।" সন্ন্যাসীটি বাবার কথা শুনিল, ও বলিল, "তবে

তুমিও বাঁশটি ফেল।" এই বলিয়া সে পাথরটি দূরে নিক্ষেপ করিল। বাবাও বাঁশটি ফেলিয়া দিলেন, কিন্তু দূরে ফেলিলেন না, নিকটেই রাখিলেন—কি জানি বাপু যদি ও আবার তেড়ে আসে। তিনি মনে মনে বিচার করিলেন যে সন্ন্যাসীটি বোকার মত কাজ করিল। যাহা হউক, এইরূপ সন্ধি স্থাপিত হইবার পর তিনি তাঁহার আনীত কাঁঠালটি উপহার দিতে চাহিলে সন্ন্যাসীটি তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ করিল এবং সেইখানে বসিয়াই সেই প্রকাণ্ড কাঁঠালটি দুই হাত দিয়া চিরিয়া অল্পক্ষণের মধ্যে সবটা খাইয়া ফেলিল।

খাওয়া শেষ হইলে শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ছেলেদের প্রতি তিনি এত খারাপ আচরণ করেন কেন। উত্তরে সন্ন্যাসীটি বলিলেন যে ছেলেগুলি অতিশয় বদ। তবে তিনি ইহাদের মত নহেন, তাই শুধু তাঁহাকেই নিকটে আসিতে দিয়াছেন। সন্ন্যাসী তখন অনেক শান্ত মূর্ত্তি লইয়াছেন এবং শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গে অনেক রকম ছেলেমানুষী বাক্যালাপও করিলেন। শ্রীশ্রীবাবা তাঁহার কথাবার্ত্তা ও কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি বাবাকে নিতে রাজী হন নাই। বলিয়াছিলেন, "পরে আবার দেখা হইবে।" ইতিমধ্যে ঘুমন্ত মা জাগিয়া উঠিয়া শয্যায় ছেলেকে না দেখিতে পাইলে কি রকম হুলুস্থুলু বাধাইবেন মনে হওয়াতে শ্রীশ্রীবাবা ফিরিতে চাহিলেন—তখন দেখিলেন যে রাত্রি প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। প্রায় রাত্রি তিনটায় তিনি তাঁহার পরবর্ত্তিকালের গুরুভ্রাতা স্বামী অভয়ানন্দজীর নিকট বিদায় লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

গৃহে ফিরিয়া অত্যন্ত স্বস্তির সহিত দেখিলেন যে তাঁহার মা তখনও তেমনই অঘোরে ঘুমাইতেছেন। তাঁহার রাত্রিকালের দুর্দ্দান্ত অভিযানের কোনও খবরই তাঁহার নাই।

চৌদ্দ বছর বয়সে জ্ঞানগঞ্জে যখন তিনি যান তখন এই সন্ন্যাসীটিকে সেখানে সন্ন্যাসী-সংঘট্টের মধ্যে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিলেন। "আর সেও আমাকে দেখিয়া সেই শ্মশানের রাত্রির ঝগড়া ও মারামারির কথা মনে করিয়া বোধ হয় হাসিতেছিল।"

(৫)

এইরূপ একটা প্রসিদ্ধি আছে যে ঠিকুজীর হিসাবে শ্রীশ্রীবাবার আয়ু ২২ বৎসর পর্য্যন্ত ছিল। তাঁহার ১২ বৎসর বয়সে যে একটা বড় ফাঁড়া ছিল তা দেখিতে পাই। সেই সময়ে তাঁহাকে ক্ষিপ্ত কুকুরে কামড়াইয়া ছিল। প্রায় ৯০ বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তুর ক্ষেপা কুকুর বা শৃগাল কামড়াইলে তাহার চিকিৎসার সূত্রটি আবিষ্কার করেন নাই। সে সময় গোঁদলপাড়াই (চন্দননগর) ছিল এইরূপ চিকিৎসার কেন্দ্র। কিন্তু ক্ষেপা শৃগাল বা কুকুরে কামড়াইলে তখন অতি সামান্য শতকরাই পরিত্রাণ পাইত—নির্ঘাৎ তাহাদের জলাতঙ্কের লক্ষণ প্রকাশ পাইত। শ্রীশ্রীবাবার সম্ভবতঃ জলাতঙ্কের লক্ষণ কখনও হয় নাই। তবে দংশন অতি তীব্র ছিল এবং তাহাতে যথেষ্ট কষ্টও পাইয়াছেন সন্দেহ নাই। ঠিক ইহারই পরবর্ত্তী কালে লিখিত তাঁহার গান-গুলিতে তাঁহার এই সময়ের জীবনের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। আত্মীয়-স্বজন সকলেই প্রতিমুহূর্ত্তে ভয় করিতেছিল যে কখন তাঁহার জলাতঙ্ক রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়—কিন্তু

শ্রীশ্রীবাবা তাহার জবাবে লিখিয়াছেন—"ভোলানাথ বলে—কচু হবে। বাঁচব শ্যামা মায়ের জোরে।" ঠিকুজীর ২২ বৎসরে বোধ হয় কোনও ঘটনা ঘটে নাই—ঘটিয়া থাকিলে তাহা অবশ্য প্রকাশ থাকিত।

২২ বৎসরে না ঘটিলেও তাঁহার ৩৮ বৎসর বয়সে তাঁহাকে আবার এক অতি ভয়াবহ দংশনের কবলে পড়িতে হইয়াছিল। এ গল্পটি শুনিয়াছি। শ্রীশ্রীবাবার বিবাহ হয় ফাল্গুন মাসে। বৈশাখ মাসে তিনি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে আনিতে মন্তেশ্বরে তাঁহার শ্বশুর আলয়ে যান। তাঁহার বিবাহের সময়ই তাঁহার অলৌকিক শক্তির কথা বেশ ছড়াইয়াছিল এবং বিবাহের বাসরে তিনি কিছু কিছু শক্তির ক্রীড়া প্রকাশ করিয়া তাঁহার নূতন আত্মীয়দের ও এই বিচিত্র উৎসবটির গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। পুরাকালের শিবের বিবাহের একটি নূতন সংস্করণ যে হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সম্বন্ধে কাহারও মনে কোনও স্মৃতি থাকিলে তাহা গল্পাকারে প্রকাশ করিলে অনেকের আনন্দের বিষয় হইবে।

এইবার বর্ণনীয় বিষয়টির অবতারণা করি। গল্পটি ক্ষুদ্র, কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও ঘটনা হিসাবে ইহার মূল্য রহিয়াছে। বোধ হয় ৩৮ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। এই ঘটনাটিও তাহা হইলে তাঁহার ৩৮ বৎসর বয়সেই ঘটিয়াছিল ধরিয়া লইতে হয়। মন্তেশ্বরে শ্বশুরালয়ে গিয়াও তাঁহার নিত্য-স্নান বাদ যাইত না। প্রতিদিন অপরাহ্নে তিনি তাঁহার এক সম্পর্কিত শ্যালককে লইয়া নিকটস্থ এক পুষ্করিণীতে স্নানে যাইতেন। পুষ্করিণীটিতে ঝাঁঝি ও পানায় ভর্ত্তি ছিল। একদিন স্নানে নামিয়াই জলে থাকা কালীন

শ্রীশ্রীবাবা বুকে দংশনের যন্ত্রণা অনুভব করিলেন। দংশনের সঙ্গে সঙ্গে কি বস্তুতে তাঁহাকে কামড়াইল তাহাও বুঝিতে পারিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে জল হইতে উঠিয়া আসিলেন। তখন তাঁহার বুকের ক্ষত স্থান হইতে রক্ত পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। তাঁহাকে এই ভাবে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিতে দেখিয়া তাঁহার শ্যালকও উঠিয়া আসিলেন ও ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন।

শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাকে বলিলেন যে তাঁহাকে জাত সাপে কামড়াইয়াছে। কিন্তু এ কথা বাহিরে যেন প্রকাশ না করা হয়। তিনি তাঁহার শ্যালককে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ওখানে নিকটে কোনও প্রতিষ্ঠিত শিব-মন্দির আছে কিনা। তাঁহার শ্যালক তাঁহাকে বলিলেন যে প্রতিষ্ঠিত শিব-মন্দির পুষ্করিণীটির অতি নিকটেই আছে এবং সেখানে নিত্য পূজাও হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীবাবা তাড়াতাড়ি মন্দিরটির দিকে চলিলেন ও মন্দির সমীপে পৌঁছিয়াই তাঁহার শ্যালককে বলিলেন, "আমি এই মন্দিরে ক্রিয়া করিতে ঢুকিলাম। এর দরজা যেন আমার বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ খুলিতে চেষ্টা না করে।" এই বলিয়া তিনি ভিতরে যাইয়া মন্দিরের অর্গল বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার শ্যালকটি অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু বাবার যোগক্রিয়ার প্রসিদ্ধিও জানিতেন। শ্বশুরবাড়ীর সকলেই তাঁহার বিবাহের রাত্রেই তাঁহার অলৌকিক যোগ-বিভূতির পরিচয় পাইয়াছিলেন। এই সব কারণে তিনি শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাকে যেরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন সেইরূপ করিতেই মনঃস্থ করিলেন। বাড়ী আসিয়া তিনি প্রচার করিলেন যে তাঁহাদের শিবতুল্য জামাতা বাবাজী স্নান

করিতে করিতে হঠাৎ উঠিয়া শিব-মন্দিরে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন এবং সেখানে যোগ-সাধনা করিতেছেন। তিনি যতক্ষণ না বাহির হন তাঁহাকে যেন বিরক্ত করা না হয়। শ্বশুর বাড়ীতে এ কথা খুব আশ্চর্য্য বোধ হইল না—কারণ তাঁহাদের জামাতা যে ঠিক সাধারণ জামাতা নহেন এ উপলব্ধি তাঁহাদের ছিল।

শ্রীশ্রীবাবা সেই মন্দির মধ্যে বোধ হয় সারারাত্রি ছিলেন এবং সকালে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার চক্ষু-যুগল তখন ঘোর রক্তবর্ণ, সমস্ত শরীর অন্যূন ১৪ ঘণ্টার যোগক্রিয়ার ফলে অসাধারণ রূপে অভিষিক্ত। বিষের চিহ্নমাত্র আর তখন তাঁহার শরীরে ছিল না, তবে ক্ষত স্থান ঠিকই ছিল। এই ক্ষতটি, অর্থাৎ দুইটি দাঁত ফুটাইবার চিহ্ন, তাঁহার শরীরের অঙ্গরূপে শোভা পাইত, যেমন শোভা পাইত শ্রীকৃষ্ণের বুকে ভৃগু-পদ-চিহ্ন।

(৬)

এই কাহিনীটির পরিশিষ্টরূপে একটি কথা মনে হইতেছে। শ্রীশ্রীবাবার বিবাহ-বাসরে তাঁহার অলৌকিক বিভূতির কিছু প্রকাশ দেখান তাঁহার শ্বশুরবাড়ীর লোকদের তাঁহার সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য হইয়াছিল! তাঁহার যে শ্যালকটি তাঁহার সঙ্গী হইয়া তাঁহার সর্পদংশনের সাথী হইয়াছিলেন তাঁহার অন্তরে শ্রীশ্রীবাবা সম্বন্ধে কোনও রূপ দৃঢ় বিশ্বাস উৎপন্ন না থাকিলে কখনই এরূপভাবে তাঁহাকে একাকী মন্দিরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিতে দেওয়া সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে অথচ দরজা খুলিতেছে না—

ইহাতে সাধারণ মানুষ তাহার মানুষী বুদ্ধিতে ইহাই স্থির করিত যে মন্দিরের ভিতরে যিনি প্রবেশ করিয়াছেন সর্পের বিষে তাঁহার আর উঠিবার ক্ষমতা নাই এবং এইজন্যই দরজা খুলিতেছে না। সমস্ত ঘটনাটি পার্থিব জগতের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া বিচার করিলে শ্রীশ্রীবাবার এই শ্যালকটি অলৌকিকভাবেই তাঁহার বিশ্বাসকে বজায় রাখিয়াছিলেন, ইহাই বলিতে হয়। শ্রীশ্রীবাবার বিভূতিগুলি জগতের এইরূপ মহান্ উপকারের জন্যই প্রকাশ পাইত, এই কথা স্বতঃই মনে আসে। আমরা রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ নহি। কর্ম্মসূত্র অতি জটিল ব্যাপার। তাহা হইতে আরও জটিল ব্যাপার মহাপুরুষদের কর্ম্মাচরণ। তবু এই কথা কেবলই মনের মধ্যে আসিয়া পড়ে যে মহাপুরুষদের জীবনে বিভূতির খেলা জগৎকেই বিভূতিসম্পন্ন করিয়া তুলে, জগতের জড়ত্ব ঘুচায়, মানুষকে মানুষীবুদ্ধি হইতে পরিত্রাণ করে।

(৭)

শ্রীশ্রীবাবা এই মানুষী বুদ্ধির কবলে কদাচিৎ পড়িয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার সমস্ত জীবনের ঘটনাগুলি তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিয়াও তাঁহাকে কোথাও এই মানুষীবুদ্ধির কবলিত হইতে দেখি নাই। ভয়, লোভ, সংশয়, অধৈর্য্য ইত্যাদি কখনও তাঁহাকে কর্ত্তব্য হইতে চ্যুত করিতে সমর্থ হইয়াছে এমন ঘটনা তাঁহার জীবনে ঘটে নাই। শুধু তাহাই নহে, মানুষের স্বাভাবিক বিচারশক্তি নিয়ন্ত্রিত হয় তাহার নিজ স্বভাবের দ্বারা। বাবার এই স্বাভাবিক বিচার শক্তি এত অন্তর্মুখীন ছিল যে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ১২।১৩ বৎসরে রচিত তাঁহার গানগুলি—গীত-রত্নাবলীতে

সংগৃহীত—তাহার সাক্ষ্য দেয়। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত পাইয়াছি যেখানে দেখা যায় রেশমাত্র মানুষীবুদ্ধি তাঁহার বিচার বুদ্ধি ও আচরণকে স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। আমাদের মত জড়, পরিপূর্ণ বহির্মুখ ও স্থূল সত্তার সঙ্গ করিবার জন্য আমাদের মত মানুষের আচরণের আভাস একটু দেখাইয়াছিল, ইহাও হয়ত বলা যায়। ঘটনাটি আমার কাছে তাই খুব মধুর লাগে।

শ্রীশ্রীবাবাকে যখন আমাদের পূজ্যপাদ পরমগুরুদেবের নির্দ্দেশে সংসারে ফিরিতে হইল তখন তাঁহাকে জ্যাঠাগুরুদেব অনেক কথাই বলিয়া দিয়াছিলেন। এমন কি কোথায় তাঁহার বিবাহ হইবে, সেখানকার নাম ধাম ইত্যাদি সবই জানাইয়াছিলেন। আমাদের মাতাঠাকুরাণীরও পরিচয় শ্রীশ্রীবাবা অনেক পূর্ব্বেই জানিতেন। বিবাহ-সম্বন্ধ যখন স্থির হইল তখন শ্রীশ্রীজ্যাঠাগুরুদেবের কথাগুলি এইভাবে মিলিয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহার মনে নিশ্চয়ই আনন্দ হইয়াছিল। অবশ্য ইহা আমার অনুমান মাত্র, কারণ আমাদের মানুষীবুদ্ধি পরিপূর্ণ জীবনে এইভাবে কিছু মিলিয়া গেলে আমাদের খুবই ভাল লাগে। যাহা হউক, বিবাহের পর দ্বিরাগমন। বৈশাখ মাসে দ্বিরাগমন করিয়া আমাদের শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে লইয়া শ্রীশ্রীবাবা বণ্ডুলে আসিলেন। কিন্তু গৃহে ফিরিয়া তাঁহার সংসারের নির্লিপ্ততা পূর্ব্ববৎ অটুটই রহিল।

আমাদের ঠাকুরমাতা ঠাকুরাণী অর্থাৎ শ্রীশ্রীবাবার মাতাঠাকুরাণী তাঁহার শিবতুল্য পুত্রের আচরণে ব্যথিত হইলেন। শ্রীশ্রীবাবার নির্লিপ্ততার পিছনে একটি রহস্য ছিল এবং তাহা শ্রীশ্রীবাবাই

নিজমুখে প্রকাশ করিয়াছিলেন—গল্পচ্ছলে। আমাদের পূজ্যপাদ মাতাঠাকুরাণী পূর্ব্বজন্মে অতিশয় নিম্নশ্রেণীর ঘরে জন্মিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ বা কোনও উচ্চবর্ণের ত ছিলেনই না—এমন ঘরের ছিলেন যাহার জলও অচল ছিল। ইহা ছিল পূর্ব্ব জন্মের ব্যাপার। বাবা এইটি জানিতেন। এইজন্য অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক তিনি একটু আল্‌গা আল্‌গা থাকিতেন। এদিকে আমাদের ঠাকুরমাতাঠাকুরাণী অনেকদিন কি করিবেন কিছু স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে একদিন মনে মনে শ্রীশ্রীজ্যাঠাগুরুদেবকে স্মরণ করিলেন। তাঁহার স্মরণমাত্রেই পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীজ্যাঠাগুরুদেব সেখানে আবির্ভূত হইলেন ও তাঁহাকে বলিলেন যে তাঁহার চিন্তা অপনোদনের ব্যবস্থা করিতেছেন।

সেইখানেই অতঃপর শ্রীশ্রীবাবার ডাক পড়িল। ডাক শুনিয়াই বাবা সব ব্যাপার বুঝিলেন ও অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর সহিত তাঁহার দাদাগুরুদেব তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি তখন তাঁহার দাদাগুরুদেবকে দণ্ডবৎ করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাঁহার দাদা-গুরুদেব পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ভৃগুরাম স্বামীজী মহারাজ একটি প্রশ্ন করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাহার সংস্কার বড়—একজন উচ্চবর্ণে থাকিয়া সাধনা করিয়া আরও উচ্চ হইয়াছে ও অপর জন অতি নিম্ন শ্রেণীতে থাকা সত্ত্বেও পর জন্মে উচ্চবর্ণে উঠিয়া তাঁহার মত স্বামী লাভ

করিতে সমর্থ হইয়াছে?" এই বলিয়া তিনি মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবা অবশ্য বাক্য দ্বারা কোনও উত্তর প্রদান করিলেন না—যেরূপ নীরবে ছিলেন সেইরূপ নীরবেই রহিলেন। পূজ্যপাদ জ্যাঠাগুরুদেব তখন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে তাঁহার আর চিন্তার প্রয়োজন নাই—সব ঠিক হইয়া যাইবে। যদি ইহার পরেও তাঁহার চিন্তার কোনও কারণ ঘটে তাঁহাকে স্মরণ করিলেই তিনি আবার উপস্থিত হইবেন এবং তাহার প্রতিকার করিবেন। এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি অন্তর্দ্ধান করিলেন।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী পূজ্যপাদ ভৃগুরাম স্বামীজী মহারাজের এইরূপ আবির্ভাবে বিস্মিত ও যারপর নাই আহ্লাদিত হইলেন। বিশেষ করিয়া তাঁহার চিন্তার কারণ আর থাকিবে না এই ভরসা পাওয়াতে তাঁহার আহ্লাদ আরও বহুগুণ বর্দ্ধিত হইল।

(৮)

উপরকার সুন্দর ঘটনাটি ঘটিয়াছিল শ্রীশ্রীবাবার গুঙ্করা থাকার প্রথম দিকে। এইবার যে ঘটনাটি বলিতেছি তাহা ঘটিয়াছিল তাঁহার গুঙ্করা থাকার একেবারে শেষের দিকে বা গুঙ্করা ত্যাগ করার পর, অর্থাৎ ১৯১১ সালের পর। এই সময় বণ্ডুলে ৺হরহরি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহার মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, নিয়মিত পূজাদির ব্যবস্থা হইয়াছে, তাঁহার মহিমারও কিছু কিছু আভাস লোক-সমাজ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

শ্রীশ্রীবাবা তখন স্বয়ং বণ্ডুলে উপস্থিত রহিয়াছেন। তখনও তাঁহার স্নান বন্ধ হয় নাই। তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে স্নান করিতে

নিকটস্থ পুকুরে যাইতেন ও স্নান ইত্যাদি সমাপনান্তে একটু আলো হইতে হইতে বাড়ী ফিরিতেন। শ্রীশ্রীবাবা যখন বাড়ী ফিরিতেন তখন তাঁহার গ্রামের অন্য সকলের উঠিয়া পুকুরে যাইবার সময় হইত। আমাদের মাতাঠাকুরাণীও সেই সময় উঠিয়া গ্রামের অন্যান্য সমবয়সী সখীদের লইয়া স্নানাদি সারিতে যাইতেন।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পান খাইবাব অভ্যাস ছিল। সকালে উঠিয়া মুখে একগাল পান লইয়া সখীদের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে পুকুর পাড়ে যাওয়া তাঁহার একরূপ নিত্য কর্ম্মের মধ্যে ছিল। একদিন এইভাবে পান চিবাইতে চিবাইতে এবং গল্প করিতে করিতে অন্যমনস্কভাবে তিনি পানের পিক ফেলিলেন। সেই পিকটি কিন্তু গিয়া লাগিল ৺হরহরির মন্দিরের সংলগ্ন প্রাচীরের গায়ে এবং সেইখানেই তাহা লালরঙের রূপ ধরিয়া নূতন পরিষ্কার দেওয়ালের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে থাকিল।

শ্রীশ্রীবাবা স্নান সারিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে মন্দিরের দেওয়ালে এই লালরঙের ছোপটি দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে এইটি কাহার কীর্ত্তি এবং মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন। বাড়ী ফিরিয়াই তিনি তাঁহার মাতাঠাকুরাণীকে ডাকিয়া মন্দিরের দেয়ালের গায়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন এবং বলিলেন, এইরূপ আর কখন যেন না হয় ও এই কথা যেন তাঁহার বধূমাতাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয়। তাহা না হইলে ৺শিবের কোপে পতিত হইতে হইবে।

আমাদের ঠাকুরমাতাঠাকুরাণী মাতাঠাকুরাণীর ফিরিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মাতাঠাকুরাণী ফিরিতেই তাঁহাকে

সব কথা বলিলেন ও পানের দাগটিকে পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া ফেলিতে বলিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী নিজের কৃত কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চয় লজ্জায় অধোবদন রহিলেন এবং তৎক্ষণাৎ জল লইয়া খুব যত্ন সহকারে দাগটি তুলিয়া ফেলিয়া অন্য কাজে হাত দিলেন। কিন্তু ঘটনার সমাপ্তি এখনও হইল না। শ্রীশ্রীবাবা অবশ্য মন্দির-গাত্র পরিষ্কার হইয়াছে জানিয়া খুশী হইলেন।

শ্রীশ্রীবাবা তখন গভীর রাত্রে মহানিশার ক্রিয়াতে রত থাকিতেন। সে রাত্রেও সেই ভাবেই একান্তে নিজ মন্দির মধ্যে রহিয়াছেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বাটীর অন্দরে নিজ গৃহে ঘুমাইতেছেন। শিশুরা তাঁহার সঙ্গে শুইয়া ঘুমাইতেছে। মধ্য-রাত্রে শ্রীশ্রীমাতাঠ্যাকুরাণী হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখেন যে ঘরের মধ্যে কে একজন দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া তাকাইয়া রহিয়াছে। তাহার চেহারা যেমন ভয়ঙ্কর, তেমনই রুক্ষ। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—হাতে একটা প্রকাণ্ড লাঠি এবং এই লাঠি ঠুকিয়া ঠুকিয়া সে তাঁহাকে শাসাইতেছে। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ভীষণ ভয় পাইলেন ও শ্রীশ্রীবাবাকে ডাকিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবা তখন সেখানে আগমন করিলেন এবং সেই ব্যক্তিটিকে চলিয়া যাইতে বলিলেন। সে যেন শ্রীশ্রীবাবার কথা শুনিয়াও শুনিতে চাহে না—বার বার বলিতে থাকে 'আবার প্রাচীর অপরিষ্কার করিলে রক্ষা রাখিব না।', যাহা হউক, সে অবশেষে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল ও বাবাও সেখান হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। শ্রীশ্রীবাবাকে দেখিয়া মাতাঠাকুরাণীর যেন ধরে প্রাণ আসিল এবং

সাহসে ভর করিয়া ছেলেরা ঠিক আছে কিনা দেখিয়া শুইয়া পড়িলেন ও ভয়ে ভয়ে বাকী রাতটুকু কাটাইলেন।

শ্রীশ্রীবাবা এই ব্যাপারটি পরদিন শুনিয়া বলিয়াছিলেন যে শিবের ভৈরব ভীষণ চটিয়াছিল এবং তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ফিরাইতে বাধ্য না করিলে সে না জানি কি করিয়া বসিত। বলা বাহুল্য, শ্রীশ্রীবাবা মহানিশার ক্রিয়াতে রত থাকা অবস্থাতেই ভৈরবের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাহির হইতে অন্দরে লৌকিকভাবে আসিলে বাড়ীর সকলেই জাগ্রত হইত—কিন্তু তাঁহার আগমন কেহই জানিতে পারে নাই, কোনও দরজাও কেহ খুলে নাই।

শ্রীশ্রীবাবা এই গল্পটি এত রসাইয়া রসাইয়া বলিতেন যে সকলের মুখে হাসি ধরিত না। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সম্পূর্ণতঃ গ্রামের মানুষ ছিলেন। কথাবার্ত্তাতে তাঁহার গ্রাম্যতা অতিমাত্রায় ছিল। শ্রীশ্রীবাবা মাতাঠাকুরাণীর গ্রাম্য ভাষার অনুকরণে যখন তাঁহার কথাগুলি বলিতেন তখন হাস্য কলরোলে ঘর মাতিয়া উঠিত। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী পরদিন সকালে তাঁহার সখী-মহলে রাত্রের ঘটনা বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে কোনও ডাকাত টাকাত আসিয়াছিল। ৺ভৈরব বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। তাই গল্প করিয়াছিলেন—"মিন্‌ষে দুর্গার বাবাকে দেখেও যাইতে চাহে না, কেবল লাঠি ঠক্‌ঠকায় আর আমার দিকে কট্‌মট্ করিয়া চায়। শেষে দুর্গার বাবা ধমক্ দিয়া চলিয়া যাইতে বলিলে ভয়ে ভয়ে চলিয়া গেল, আর আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।"

(৯)

শ্রীশ্রীবাবা এ জগতের লোক নহেন। তাঁহার আবির্ভাব এ জগৎকে অলৌকিক করিয়াছে ও অগ্রগতির পথে আগাইতে সাহায্য করিয়াছে। এক দৃষ্টিতে তাই তাঁহার সমগ্র জীবনটাই এক অলৌকিক ব্যাপার। তাহা সত্বেও তিনি এই জগতেরই মানুষ। কারণ তাঁহার অঙ্গের অংশরূপে তাঁহার কৃপা-প্রাপ্ত জীবগুলি এখনও পূরাপূরি মানুষই। এই লৌকিক ও অলৌকিক সমন্বয় অন্য কাহারও জীবনে এত সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিতে দেখি নাই। তাঁহার যোগদর্শনও তাই প্রচলিত যোগ-দর্শনের সহিত সব স্থলে ঠিক মিলে না। এখানেও ঠিক সেই সমন্বয় রহিয়াছে যাহার দ্বারা জীবের আধারে ভগবৎ-শক্তির ক্রিয়া অনায়াসে হয়। আমরা তাঁহাকে এক খণ্ড-মূর্ত্তির মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া দেখিতে অভ্যস্ত হইতেছিলাম। ইহা তাঁহার স্বরূপের পরিপন্থী ছিল। কাজে কাজেই আমাদের চক্ষের সামনে সে ভুলটি তিনি ভাঙিয়াছেন। তিনি নিজ খণ্ড-মূর্ত্তি ধরিয়াও আজ সর্ব্ব-ব্যাপী সত্তা। এই সর্ব্বব্যাপী সত্তার বোধ যখন আমাদের জাগিবে তখন আবার তাঁহার মূর্ত্তরূপ আমাদের নিকট প্রকাশ পাইবে। অন্ততঃ এই আশাই জাগিয়া রহিয়াছে এই ক্ষুদ্র জীব সত্তাটির প্রাণের ক্রন্দনে।

নমস্তে সতে সর্বলোকাশ্রয়ায়,
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়,
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥

তদেকং স্মরামস্তদেকং জপামঃ,
তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং,
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥

জয়তি পরগুরুঃ শ্রীশৈলজা-যুক্তদেহো
রজনিরমণ মৌলির্যোগিরাজাধিরাজঃ।
জয়তি চ নরমূর্ত্তির্দেবদেবঃ স এব
বিতত-বিপুল-ভূতিঃ শ্রীবিশুদ্ধাভিধানঃ॥

আরোপ সাধন

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট

(১)

সাধনা বহু প্রকার আছে এবং সাধকের অধিকার অনুসারে প্রত্যেকটি সাধনার সার্থকতা আছে। সাধকের যেমন যোগ্যতার তারতম্য আছে, তেমনি তদনুসারে সাধনের ফলগত তারতম্যও আছে। যাঁহারা সাধনার ইতিহাস আলোচনা করেন তাঁহারা তটস্থ দৃষ্টিতে তারতম্য, অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধক নিজে তটস্থ দৃষ্টি গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া ইহা ধারণা করিতে পারে না। রুচি ও শক্তির বিকাশ অনুসারে যে সাধক যে মার্গ অবলম্বন করিয়া সাধন পথে চলিতে থাকে তাহার নিকট তৎকালে সেই মার্গের লক্ষ্যই সাধনার চরম সিদ্ধি বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। অন্য মার্গের সহিত তুলনা করিয়া তারতম্য বিচার করার সামর্থ্য তাহার থাকে না। ইহাই সাধারণ নিয়ম এবং ইহা স্বাভাবিক। তবে স্থিতি বিশেষে ইহার ব্যভিচারও যে দৃষ্ট হয় না তাহা নহে।

আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে আরোপ-সাধন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আমি যাহা বলিব তাহা যদিও কোন বিশিষ্ট ধারা অবলম্বন করিয়াই বলিব তথাপি তাহার মধ্যে যে গভীর তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে তাহা অবস্থা বিশেষে অন্যান্য সাধন-পদ্ধতিতেও আংশিকভাবে লক্ষিত হইতে পারে। আরোপ-সাধন

যোগি-সমাজেও অত্যন্ত নিগূঢ় সাধন রূপে স্বীকৃত হয়—ভাগ্যবান্ ভক্ত ভিন্ন অপর কেহ ইহার রহস্য অবগত নহে। প্রচলিত অধিকাংশ সাধন আত্মদর্শনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়,—আত্মদর্শন হইলেই সিদ্ধিলাভ হইয়াছে মনে করিয়া অগ্রিম পথে আর কেহ অগ্রসর হয় না। এই আত্মদর্শন প্রাথমিক আত্মদর্শন, পূর্ণ আত্ম-দর্শন নহে। প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌ভাবে আত্মাকে দর্শন করাই প্রাথমিক আত্মদর্শনের উদ্দেশ্য। এই প্রারম্ভিক আত্মদর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত আরোপ-সাধনের সূত্রপাতই হয় না। আরোপ-সাধনের ফলে যে পূর্ণ আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয় তাহা অদ্বৈত আত্ম-স্বরূপে অবস্থিতি। তাহা বহুদূরবর্ত্তী আদর্শ। কিন্তু প্রাথমিক আত্মদর্শনও সাধন পথে অতি উচ্চ অবস্থার সূচনা করিয়া থাকে। যাহা হউক, আরোপ-সাধনের বৈশিষ্ট্য ইহা হইতে কিয়দংশে অনুমিত হইতে পারে।

দীক্ষার সময় গুরু শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে ইষ্টমন্ত্র দান করিয়া থাকেন, ইহা সকলেই জানেন। বস্তুতঃ গুরু যে বাহির হইতে সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় শিষ্যকে শব্দ-বিশেষ শুনাইয়া দেন তাহা নহে—তিনি দীক্ষার সময় অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তর্যামি-রূপে শব্দব্রহ্মময় জ্ঞান দান করেন। এই জন্যই দীক্ষাদাতা গুরুকে জ্ঞানদাতা রূপে শাস্ত্রকারগণ বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞান, কারণ ইহা শব্দ হইতে উত্থিত হয়।

জ্ঞান দুই প্রকার। একটি শব্দজ অর্থাৎ উপদেষ্টা গুরুর উপদেশ-বাণী হইতে শিষ্যের হৃদয়ে পরোক্ষরূপে উদ্ভূত। ইহাকে আগমোত্থ অথবা আগমজন্য জ্ঞান বলা হয়। কেহ কেহ ইহাকে

ঔপদেশিক জ্ঞান বলিয়া থাকেন। দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান শব্দ হইতে উত্থিত হয় না অর্থাৎ গুরু বাক্য হইতে জন্মে না, কিন্তু শিষ্যের বিবেক হইতে আপনা আপনি উদ্ভূত হয়। ইহাকে বিবেকজ জ্ঞান বলে—প্রাতিভ জ্ঞান ইহার নামান্তর। ইহা অনৌপদেশিক। কারণ ইহা অন্যের মুখ-নিঃসৃত উপদেশ-বাণী হইতে উৎপন্ন হয় না। এইটি প্রত্যক্ষ জ্ঞান। সদ্‌গুরুর বিশিষ্ট কৃপার উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত এই দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান আবির্ভূত হয় না। বস্তুতঃ এই জ্ঞানই তারক জ্ঞান—ইহার অবিষয় কিছুই থাকে না। ইহাতে একই ক্ষণে অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান সকল পদার্থের সর্ব্ববিধ জ্ঞান বিদ্যমান থাকে। এই জ্ঞানে ক্রম থাকে না, দেশগত অথবা কালগত ব্যবধানের প্রশ্ন থাকে না,—সর্ব্বজ্ঞত্ব ইহারই নামান্তর। গুরুর মৌখিক উপদেশ হইতে এই প্রকার প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে না। এই মহাজ্ঞানের সঞ্চার-কালে সদ্‌গুরু বাহ্যতঃ কোন বাক্য প্রয়োগ করেন না, কিন্তু মৌনী থাকেন, অথচ ইহার এমনি প্রভাব যে ইহাতে যাবতীয় সংশয় ছিন্ন হইয়া অখিল কর্মবন্ধন ক্ষীণ হয় এবং হৃদয়ের মর্ম্ম-প্রবিষ্ট গ্রন্থি সকল ছিন্ন হয়। "গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যস্তু ছিন্নসংশয়ঃ।"

পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করার পর সাধকের চিত্তে যতদিন পর্য্যন্ত ইষ্ট-সাক্ষাৎকারের জন্য ব্যাকুলতা না জন্মে ততদিন সদ্‌গুরুর কৃপার উদয় হয় না এবং অপরোক্ষ জ্ঞানের আবির্ভাব হইতে পারে না। কঠোর তপস্যা, কৃচ্ছ্র সাধন, অভাবের বেদনা, লাঞ্ছনা, আধি ও ব্যাধি এবং নানা প্রকার পরীক্ষা অতিক্রম করিতে না পারিলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য উৎকট তৃষ্ণা জন্মে না। গুরুর মঙ্গলময়

ইচ্ছাতে সাধককে বহু প্রকার অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। কেহ কেহ এই সকল অবস্থাকে প্রারব্ধের ফল-ভোগ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। নানা প্রকার প্রলোভন এবং পরীক্ষা দ্বারা সাধকের চিত্ত প্রকৃত সত্যের অন্বেষণের পথে জাগ্রত থাকে। অনেক সাধকের বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের পরীক্ষা এই সময়েই হইয়া থাকে। যাহার চিত্তে যে অংশে দুর্ব্বলতা তাহার সেই অংশেই সাধারণতঃ পরীক্ষা হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য ভক্ত mystic গণের বর্ণনা অনুসারে এই সময়টীকে Dark Night of the Soul, এমন কি Dark Night of the Spiritও, বলা যাইতে পারে। ইহা সত্যই গভীর অমানিশার ন্যায় অন্ধকারময় ও আতঙ্কপ্রদ। প্রবল উৎকণ্ঠা, গুরুর আদেশানুসারে যথাশক্তি সাধনার চেষ্টা, নৈতিক জীবনের মহান্ আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখা এবং অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ধৈর্য্য ও সহনশীলতার দ্বারা নিজের চিত্তকে সংযত ও স্থির রাখিতে চেষ্টা করা এবং সর্ব্বোপরি অবশ্যম্ভাবী গুরু-কৃপার উপর অটল শ্রদ্ধা রাখিয়া তাহার জন্য একান্ত-মনে প্রতীক্ষা করা—ইহাই এই সময়ের একমাত্র কর্ত্তব্য। এই অবস্থার মধ্যে অতর্কিতভাবে সদ্‌গুরুর মহাকরুণা আত্মপ্রকাশ করে এবং সাধকের তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে শান্তি ও আনন্দময় চৈতন্যের উজ্জ্বল জ্যোতি ফুটিয়া উঠে। অত্যন্ত উত্তাপময় গ্রীষ্ম ঋতুর অবসানে নব বর্ষার সূত্রপাত হইলে তাপ-ক্লিষ্ট জীব-জগৎ যেমন উৎফুল্ল হয়, ঠিক সেই প্রকার দীর্ঘকালের অবসাদ ও নৈরাশ্যের পর গুরু-কৃপার আবির্ভাব হইলে সাধকের চিত্তও সর্ব্বপ্রকার সংশয় ও চঞ্চলতা হইতে মুক্ত হইয়া একটি

শান্ত ও স্থির আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অবস্থার নাম প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদয়—যে জ্ঞানে সংশয় অথবা বিকল্পের স্থান নাই। সূর্য্যের উদয় হইলে তিমির-রাশি যেমন ঐ কিরণের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া অপসারিত হয়, তদ্‌রূপ অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় হইলে চিত্তস্থিত অনাদিকালের সঞ্চিত আবর্জ্জনা রাশি মুহূর্ত্ত মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। শব্দব্রহ্ম হইতে শব্দাতীত পরব্রহ্মের অধিগম এই প্রকারেই হইয়া থাকে।

এই পরব্রহ্মরূপী আত্মা বা সাক্ষী নির্ম্মল চৈতন্যস্বরূপ। ইনি মানবের দেহে ও বিশ্বে সর্ব্বত্র অসঙ্গভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, দেশ কাল ও আকৃতির বন্ধন ইঁহাতে নাই। তাই সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ও সর্ব্ব আকারের মধ্যে ইনি সমরূপে বিরাজ করেন। কিন্তু এমনই অদ্ভুত রহস্য যে ইনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতিরেকে কাহারও দৃষ্টিগোচর হন না। এক খণ্ড লৌহকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া দীর্ঘকাল পর কুণ্ড হতে উঠাইয়া লইলে যে অগ্নিময় লৌহ-খণ্ড দৃষ্টিগোচর হয় তাহাতে একাধারে যেমন অগ্নিও আছে ও লৌহও আছে, উভয়ই পরস্পর মিশ্রিত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, তদ্‌রূপ একই আধারে দেহ ও আত্মা দুই-ই বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু অপৃথক্‌ভাবে বা মিশ্রভাবে, কারণ দেহ হইতে আত্মাকে অথবা আত্মা হইতে দেহকে পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করা যায় না। একমাত্র গুরূপদিষ্ট কর্ম্ম-কৌশলে এই আত্ম-বস্তুকে দেহ হইতে বা প্রকৃতির অংশ হইতে পৃথক্ করিয়া দর্শন করা যায়। ইহাই বিবেক-জ্ঞানের উদয়, যাহা এক হিসাবে আত্মদর্শন নামে সাধক-সমাজে পরিচিত। সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমভাবে যাহা বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা তাহারই

সাক্ষাৎকার। ইহারই নাম জ্ঞান-চক্ষুর উন্মীলন। এই সময়ে দীক্ষা-কালে প্রাপ্ত পরোক্ষ জ্ঞান সাক্ষাৎ অপরোক্ষ জ্ঞানরূপে পরিণত হয়। আরোপ সাধক যোগিগণ এই সাক্ষিস্বরূপ চিন্ময় সত্তাকে তাঁহাদের সরল ভাষায় 'বর্ত্তমান' নামে অভিহিত করেন। এই 'বর্ত্তমান' প্রকৃত প্রস্তাবে নিরাকার ও সাকার উভয় সত্তার একমাত্র সমন্বয়-ভূমি। গীতোপদিষ্ট উত্তম পুরুষে বা পরমাত্মাতে যেমন ক্ষর ও অক্ষর উভয় সত্তার সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে তদ্রূপ এই নিত্য বর্ত্তমানে নিরাকার ও সাকার উভয় সত্তাই বিরাজ করিতেছে। তাই আরোপ সাধক বলেন—

'সাক্ষিভুত বর্ত্তমান দাঁড়ায়ে সাক্ষাতে,
নিরাকার ও সাকার এই দুই দেখ তাতে।'

এই বর্ত্তমানের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের কার্য্য সমাপ্ত হইয়া যায়, কারণ এই বর্ত্তমানই জ্ঞেয় অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় ও ইহাকে অভিব্যক্ত করাই জ্ঞানের উদ্দেশ্যে। কর্ম যেমন জ্ঞানের উদয়ে সার্থক হয়, তদ্রূপ জ্ঞানও জ্ঞেয় আবিভূর্ত হইলে সার্থক হয়। জ্ঞেয়ই ইষ্ট, সুতরাং কর্ম ও জ্ঞানের প্রভাবে ইষ্টের আবির্ভাব হইলে সাধক উভয়ের অতীত এক অভিনব উন্নত স্তরে প্রবেশ লাভ করেন। যে সাধক এইখানেই নিবৃত্ত হন তাঁহার পক্ষে পরবর্ত্তী অবস্থার প্রাপ্তি সম্ভবপর হয় না। এই অবস্থা আত্মদর্শন হইলেও ইহা যে পূর্ণ আত্মদর্শন নহে এবং এ অবস্থাতে স্থিতি যে অখণ্ড আত্মস্বরূপে স্থিতি নহে তাহা বলাই বাহুল্য।

(২)

এইবার সাধকের জীবনে প্রেমের কার্য্য আরম্ভ হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিতেন কর্ম হইতে জ্ঞান হয়, জ্ঞান হইতে ভক্তি হয় এবং ভক্তি হইতে প্রেম হয়। বাস্তবিক পক্ষে জ্ঞানের কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত রস-সাধনার সূত্রপাত হইতে পারে না। রস-সাধনার জন্য ভাবের বিকাশ আবশ্যক এবং ভাবের বিকাশের জন্য তৎপূর্ব্বে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদয় আবশ্যক, কিন্তু শুধু প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিলেই ভাবের উদয় হইতে পারে না, তাহার জন্য আনুষঙ্গিক সাধনা আবশ্যক। এইবার আমরা সেই আনুষঙ্গিক সাধনার পরিচয় দিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিব। আমরা যাহাকে আরোপ-সাধনা বলিয়াছি পূর্ব্বোক্ত আত্মজ্ঞান লাভের পরেই তাহার অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয়, এবং এই আরোপ সাধনার ফলেই পূর্ণ আত্মস্বরূপে স্থিতি, আত্মারাম অবস্থা লাভ, নিত্য লীলার আস্বাদন প্রভৃতি মনুষ্যের পরাৎপর পুরুষার্থ সকল সিদ্ধ হয়।

সিঁড়ি অবলম্বন করিয়া ছাদে উঠিতে পারিলে ঐ সিঁড়ির প্রয়োজন যেমন আর থাকে না, তেমনি কর্ম্ম ও জ্ঞান অবলম্বন করিয়া জ্ঞেয়কে প্রাপ্ত হইলে কর্ম্ম ও জ্ঞানের প্রয়োজন আর থাকে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জ্ঞেয়ই ইষ্ট—ইনি সদা ও সর্ব্বত্র বর্ত্তমান পুরুষোত্তম। কৃষ্ণ-উপাসকের ইনি নিত্য কৃষ্ণ এবং রাম-উপাসকের ইনি নিত্য রাম। সকল উপাসকেরই আপন আপন ইষ্টরূপে ইনিই একমাত্র উপাস্য।

দীক্ষাকালে যে শব্দ মন্ত্রদাতা গুরুর মুখ হইতে শিষ্যের কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছিল সদ্‌গুরুর কৃপায় সেই শব্দই আজ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অবস্থায় জ্ঞেয়রূপে অথবা চিন্ময় ইষ্টরূপে প্রকাশমান হইয়াছে। বৈখরী বাক্ আজ পশ্যন্তী ভূমিতে আরূঢ় হইয়াছে। ক্রিয়া, মন্ত্র;

জপ প্রভৃতি সার্থক হইয়াছে, কারণ যে বস্তু এতদিন শুধু শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত ছিল আজ তাহা নেত্রের বিষয়ীভূত হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রবণ-জাত জ্ঞান সাক্ষাৎ দর্শনে পরিণত হইয়াছে। এখন আর পৃথক্‌ভাবে ক্রিয়াদির প্রয়োজন নাই। কারণ আত্মভাবে নিষ্ঠা জন্মিলে সাধকের সকল চেষ্টা অর্চ্চনাতে পরিণত হয় এবং সকল বাক্যই মন্ত্র-জপের তুল্যতা লাভ করে।

এই বর্ত্তমান রূপই আরোপ সাধকগণের পরিভাষাতে **'শ্যামবিন্দু'** নামে পরিচিত। জগতের অনন্ত রূপ, অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান ত্রিবিধ কাল, দূর ও নিকট যাবতীয় দেশ, সবই এই নিত্য বর্ত্তমানে অভিন্নভাবে স্থিত রহিয়াছে। এই রূপের উদয় হইলেই জগৎ আলোকিত হয় এবং ইহার তিরোভাবের ফলে জগৎ আচ্ছন্ন হয়।

এইরূপটি অতি গুপ্ত এবং গুহ্য। যদিও ইহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই পূর্ণরূপে প্রকাশমান রহিয়াছে, তথাপি আবরণে আবৃত বলিয়া সকলের চক্ষে ইহা ভাসে না। দ্রষ্টার চক্ষুতেও আবরণ আছে, আবার বস্তুর স্বরূপেও স্ব-কল্পিত আবরণ আছে। অখণ্ড সত্তার প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত আবরণ থাকা স্বাভাবিক। আত্মদর্শনের পর এই দৃষ্টিগোচর আত্মস্বরূপকে নিয়ত ভজন করা আবশ্যক। ইহা কর্ম্মের অঙ্গভূত উপাসনারূপ ভজন নহে, ইহা নিত্য ভজন—ইহাতে দিক্, দেশ ও কালের কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। ইহাতে দশাগত, বর্ণগত, পরিমাণগত এবং লিঙ্গগত কোন ভেদ নাই। ইহা চিন্ময়, সর্ব্বরূপ ও সর্ব্বাকার। সাধকগণ ইহাকে নিষ্ক্রিয় ভজন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

ইহা সর্ব্বাকার হইলেও সাধক স্বয়ং মনুষ্যরূপী বলিয়া নিজের ইষ্টকে পাইলেই তাঁহার ভজনের অনুকূলতা জন্মে। সেইজন্য সাধকের কল্যাণ কামনায় তাঁহার জ্ঞেয় বা ইষ্ট মনুষ্যাকার হইয়া প্রকাশিত হন। মনুষ্য-আকারের বৈশিষ্ট্য এই যে সাধক নিজে মনুষ্য বলিয়া এই ইষ্ট আকার প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার নিজেরই আকার অথবা নিজের সহিত অভিন্ন আকাররূপে প্রতিভাসমান হয়। তখন ভক্ত সাধকের নিজ দেহের প্রতি যে সেবা বা পরিচর্য্যা করা হয় তাহা তাঁহার ইষ্টের পরিচর্য্যারূপে পরিণত হয়। ভক্তের রূপ ও তাঁহার ভজনীয়ের রূপ পৃথক্ হইয়াও তখন অপৃথক্‌ভূত, উভয়ই তখন সমসূত্র। ইষ্ট তখন ভক্তের সঙ্গে যোগে থাকিয়া অনুরাগে অনুষ্ঠিত ভক্ত-সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন। পরব্রহ্ম তখন মনুষ্যাকার বা নররূপী। ভক্ত মনুষ্য, তাই ভগবান্ মনুষ্য, উভয়ে কোন ব্যবধান নাই।

এই নিত্য বর্ত্তমানের দর্শন অপরিসীম ভাগ্যের কথা, গুরু কৃপার পরাকাষ্ঠা এই দর্শনেই জানিতে হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি নিত্য বর্ত্তমানে ত্রিকালই ভাসে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ত্রিকাল কোথায়? একমাত্র বর্ত্তমানই ভূত-ভবিষ্যৎকে আক্রমণ করিয়া নিজের অসম প্রভাবে বিরাজ করিতে থাকে। এইজন্যই সাধক যে কোন অবস্থাতে এই স্থিতি লাভ করেন ঐ অবস্থা তাঁহার পক্ষে আর অবস্থা থাকে না, উহা নিত্য বর্ত্তমানরূপে প্রকাশিত হয়। তাই ভজনের প্রভাবে ঐ অবস্থা বা দশা বিকার-রহিত হইয়া নিত্য অথবা চিরস্থায়ী রূপ ধারণ করে। তখন উহা কালের দশারূপে পরিগণিত হয় না—উহা কালাতীত হয়। এটিকে নিত্য

দেহ বলে। যে দেহ যে বয়সে যে রূপে ভজন করে তাহাই নিত্য দেহরূপে প্রকট হইয়া থাকে।

(৩)

আরোপ সাধনা অভ্যাস-সাপেক্ষ। এই অভ্যাসের ক্রম আছে। স্থূলভাবে এই ক্রমের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে চেষ্টা করিতেছি।

(ক) সাক্ষিভূত সম্মুখস্থিত বর্ত্তমানে নিরাকার ও সাকার উভয় সত্তা দেখিতে অভ্যাস করা আবশ্যক।

(খ) মনের উৎকণ্ঠা এবং প্রাপ্তির লালসা যাহাতে ক্রমশঃ অধিকতর তীব্র হয় তাহার জন্য চেষ্টা করা উচিত। বিষয় ও বিষয়ীর সংসর্গ যথাসম্ভব পরিহার করিয়া চলা উচিত, কারণ ইহা ভজনের অন্তরায়-স্বরূপ। আকাঙ্ক্ষা যাহার যত তীব্র হইবে প্রাপ্তি তাহার তত নিকটবর্ত্তী জানিতে হইবে। সুতরাং আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া হৃদয় হইতে আশার কণিকা পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিতে হইবে, অর্থাৎ আশা না রাখিয়া শুধু আকাঙ্ক্ষাকে বাড়াইতে হইবে।

(গ) একান্ত-বাস এই সাধনের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। যত অধিক সময় সম্ভবপর হয় নির্জ্জন স্থানে অবস্থানের চেষ্টা করা উচিত। লোক-সংসর্গ যথাশক্তি বর্জ্জনীয়, কারণ উহাতে শক্তি-ক্ষয় হয়। একান্ত স্থানে থাকিবার সময় এমনভাবে অবস্থান করিবে যাহাতে কেহ দেখিতে না পায়। দেহটিকে যে কোন প্রকারেই হউক স্থির রাখার অভ্যাস করা উচিত। প্রোথিত

স্তম্ভ যেমন নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান থাকে দেহকে তাহার অনুরূপ-ভাবে স্থির রাখিতে চেষ্টা করা উচিত।

(ঘ) দেহ-স্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই মনকে সর্ব্বদা যথাশক্তি ভ্রূমধ্যে ধারণ করিবার চেষ্টা করা উচিত। ইহারই সহকারিরূপে নিমেষ ও উন্মেষ বর্জ্জিত অবস্থা প্রাপ্ত হইবার জন্য চক্ষুর পলক যাহাতে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত না পড়ে সেইদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। ইহার নাম 'নিমেষ-বর্জ্জন'। পক্ষান্তরে অভ্যাসের সময় তন্দ্রা ও নিদ্রার আবেশ যাহাতে না হয় যে সম্বন্ধে অবহিত হওয়া আবশ্যক। নিমেষপাত ও ক্ষণমাত্রের জন্য তন্দ্রার উদয় আদর্শ-প্রাপ্তির অন্তরায় স্বরূপ। নিমেষ বা পলক পড়িবার আশঙ্কা হইলে চক্ষুকে শিথিল করিয়া রাখা উচিত। দীর্ঘকাল অভ্যাসের ফলে ইচ্ছানুরূপ নিমেষ-বর্জ্জন আয়ত্ত হয়। ইহা একটি উচ্চ অবস্থা। এইভাবে মন স্থির হয়, বায়ু স্থির হয়, এবং অপ্রার্থিত হইলেও সিদ্ধি সকল আয়ত্ত হয়। আরোপ সাধক কৃত্রিম ভাবে প্রাণায়াম বা কুম্ভকাদির অভ্যাস করেন না—তাঁহার প্রাণ স্বাভাবিক রীতিতে উপশম প্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য হঠ-যোগাদি-সাধ্য প্রাণায়াম ক্রিয়ার আবশ্যকতা হয় না।

(৪)

মন, বায়ু ও দৃষ্টি স্থির হওয়ার কথা পূর্ব্বে বলা হইল। যখন এই স্থিতি লাভ সম্পন্ন হইবে তখনই পরবর্ত্তী সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তৎপূর্ব্বে নহে! ইহার নাম 'লক্ষ্য-বেধ'। লক্ষ্য কাহাকে বলে? সাধকের হৃদয়নিষ্ঠ গুরুদত্ত ইষ্টরূপই লক্ষ্য। এই অন্তঃস্থিত রূপকে চক্ষুর্দ্বয়ের বাহিরে আকর্ষণ করিয়া

আনিতে হইবে এবং সম্মুখে স্থান-বিশেষে স্থাপন করিতে হইবে। যাহা হৃদয়-আকাশে গুপ্তরূপে নিহিত ছিল তাহাকে বাহির করিয়া বহিরাকাশে ব্যক্তরূপে স্থাপন করিতে হইবে। হৃদয়-আকাশ* ও বহিরাকাশের যেটি সন্ধি তাহাই লক্ষ্য-প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত স্থান বা কেন্দ্র। এই প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে অধিক রহস্য প্রকাশ করা উচিত মনে করিলাম না। সন্ধির ওপারে স্থির বায়ু এবং এপারে চঞ্চল বায়ু। চঞ্চল বায়ুর সীমার বাহিরে স্থির বায়ুর প্রান্ত ভূমিতে লক্ষ্যকে স্থাপন করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে ভ্রূ-মধ্যে স্থিরীভূত মনকেও ঐস্থানে বসাইবে। নিমেষ ত্যাগ করার অভ্যাস পূর্ব্বে সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া এবার দৃষ্টিকে নিমেষ-বর্জ্জন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত লক্ষ্যস্থানে সন্ধান করা আবশ্যক। ইহার ফলে মন, নেত্র ও লক্ষ্য এক হইয়া প্রকাশিত হইবে। ইহার নাম লক্ষ্য-বেধ†। লক্ষ্যবেধের সময় মনে যাহাতে অন্য ভাব না থাকে এবং দৃষ্টিতে অন্য কিছু না ভাসে তাহার জন্য অবহিত থাকা আবশ্যক।

---

*ইহা যোগিগণের পরিচিত লক্ষ্যত্রয়ের অন্তর্গত বহির্লক্ষ্যের প্রকার ভেদ মাত্র।

†মুণ্ডকোপনিষদে প্রকারান্তরে লক্ষ্যবেধের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। দেহ সাধকের ব্রহ্মই লক্ষ্য, আত্মাই শর এবং প্রণবই ধনুঃ। প্রণব দ্বারাই ব্রহ্মে আত্মাকে প্রবিষ্ট করাইতে হয়। লক্ষ্যবেধের নিদর্শন সূতসংহিতাকার এইভাবে দেখাইয়াছেন –

লক্ষ্যং সর্বগতং চৈব পরোক্ষং সর্বতোমুখম্।
বেদ্ধা সর্বগতশ্চৈব বিদ্ধং লক্ষ্যং ন সংশয়ঃ॥

(৫)

লক্ষ্যবেধ ক্রিয়া ঠিক ঠিক নিষ্পন্ন হইলে সাধকের হৃদয়স্থিত রূপ দৃষ্টির সম্মুখে বাহিরে প্রকাশিত হয়। রূপ নয়নগোচর হইলেই ঐ রূপের প্রত্যেকটি অঙ্গ দর্শন করা আবশ্যক। সাধক-সমাজে ইহার জন্য একটি বিশিষ্ট প্রক্রিয়ার বিধান রহিয়াছে। প্রথমতঃ ঐ বহিরাকাশস্থিত মূর্ত্তির পদতল হইতে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদিকে এক একটি অঙ্গের উপর অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টি স্থাপন করিতে হয়। এই প্রকারে মস্তকের অগ্রভাগস্থিত কেশান্ত পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ আবশ্যক। ইহার নাম অধঃ-ঊর্দ্ধক্রম। ইহার পর ঊর্দ্ধ হইতে অধোদিকে, অর্থাৎ কেশান্ত হইতে পদতল পর্য্যন্ত ক্রমশঃ এক এক অঙ্গের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হয়। এই ভাবে একবার অনুলোমে এবং একবার বিলোমে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করা আবশ্যক। চক্ষুকে কোমল ও সরল ভাবে রক্ষা করিয়া দৃষ্টি সন্ধান আবশ্যক। উদ্দেশ্য এই, বাহ্য রূপের প্রতি অঙ্গই যেন দৃষ্টির সম্মুখে নিরন্তর ভাসিতে থাকে। অভ্যাসের সময় ক্রম অবলম্বন করিয়া এক অবয়বের পর অপর অবয়ব নিরীক্ষণ করিতে হয়, ইহা সত্য। কিন্তু অভ্যাস ঠিক ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে সকল অঙ্গই যুগপৎ দৃষ্টিগোচর হয়, ক্রমিক দর্শনের আবশ্যকতা আর থাকে না। যদি কখনও কোন কারণে কোন অঙ্গ দৃষ্টির সম্মুখে না ভাসে তাহা হইলে ঐ অঙ্গে পুনর্ব্বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সর্ব্ব অঙ্গ একসঙ্গে উদ্‌ভাসিত না হইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই প্রকারেই অভ্যাস করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হইবে। এই রূপ-সন্ধান ব্যাপারে

কালাকাল অথবা শুচি-অশুচির কোন বিচার নাই। ইহা সর্ব্বদাই করা উচিত— শয়নে, উপবেশনে, চলনে, স্থিতিকালে, সব সময়ে ইহা করণীয়। কোন সময় বাদ দেওয়া উচিত নয়।

দীর্ঘকালের অভ্যাসের ফলে বাহ্য রূপের সর্ব্বাঙ্গ একই সময় দৃষ্টিতে ভাসিবে। তখন অখণ্ড মণ্ডলাকারে সমস্ত শরীর প্রকাশিত হইবে এবং শরীরটি প্রাণযুক্ত অর্থাৎ জীবন্তরূপে প্রতিভাসমান হইবে। এই অবস্থায় সাধকের নয়নের সহিত সাধ্য-রূপের নয়নের মিলন ঘটিবে। এই চারি চক্ষুর মিলনই শুভদৃষ্টি বলিয়া জানিতে হইবে। এই সময় হইতে সাধক ও সাধ্য বা ইষ্ট উভয়ের জন্য উভয়ের অস্থিরতা অথবা চাঞ্চল্য উৎপন্ন হইবে। ইষ্ট প্রাণময় না হওয়া পর্য্যন্ত এই প্রকার চাঞ্চল্য জন্মে না। বস্তুতঃ উপাস্য মূর্ত্তিতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইলে এইরূপই হইয়া থাকে। ইহা না হইলে, মূর্ত্তি মূর্ত্তিমাত্র, উহা মৃন্ময়, শিলাময়, দারুময় অথবা জ্যোতির্ম্ময় হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না। বাহ্যরূপ প্রাণময় না হওয়া পর্য্যন্ত উহা সাধকের ভাবানুসারে সাড়া দিতে সমর্থ হয় না।

(৬)

ইহার পর ভাবের উদয় হয়। সাধক তখন আনন্দে আত্মহারা হইয়া নিজের কায়, মন ও বাক্য, এমন কি তাহার সর্ব্ব-স্ব অর্থাৎ তাহার চতুর্বিংশতি তত্ত্বময় শরীর ইষ্টকে সমর্পণ করে এবং তখন হইতে তাঁহার শরণ গ্রহণ করে। ইহার ফলে সাধক ঐ জীবন্ত ইষ্টরূপ সর্ব্বদাই দেখিতে পায়। বেদে আছে, 'সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।' ইহা কোন কোন অংশে তাহারই অনুরূপ অবস্থা।

যতক্ষণ রূপে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার পর সাধকের হৃদয়ে ভাবের জাগরণ না হয় ততক্ষণ ঐ রূপ ঠিক ঠিক চেতন রূপ নহে এবং উহা সর্ব্বদা দৃষ্টিগোচর হয় না। কখনও উহা দৃষ্টিগোচর হয়, আবার কখনও উহা দৃষ্টি হইতে অন্তরাল হইয়া যায়। সূর্য্যের যেমন একবার উদয় হয় এবং একবার অস্ত হয়, তার পর কিছু সময় অদর্শনের পর পুনর্বার উদয় হয়, ঐ রূপও তখন উদয়াস্তময় দ্বন্দ্ব অবস্থার মধ্যে থাকে। শাস্ত্রে এ প্রকার রূপকে শান্তোদিত রূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু সাধকের হৃদয়ে ভাব জাগিয়া উঠিলে এই অবস্থার মধ্যে পরিবর্ত্তন ঘটে। তখন আবির্ভূত রূপ চিন্ময় বলিয়া আর তিরোহিত হয় না। বস্তুতঃ তখন ঐ রূপের উদয়ও নাই, অস্তও নাই—শাস্ত্রীয় পরিভাষাতে উহার নাম নিত্যোদিত রূপ।

রাত্রে, দিনে, নিদ্রায়, জাগরণে, শয়নে, ভোজনে, সর্ব্বকালে, আসনে বসিয়া, এমন কি পথে চলিতে চলিতে, সাধক সর্ব্বদা তাহার নিত্য সঙ্গী ইষ্টের দর্শন লাভ করিয়া থাকে। তখন সাধ্যের সঙ্গে সাধকের বিচ্ছেদ চিরদিনের জন্য কাটিয়া যায়। সংসারের সুখ-দুঃখ ও জ্বালা-যন্ত্রণা সাধককে আর কখনও স্পর্শ করে না—আঘাত করা ত দূরের কথা। কারণ সাধকের মন তখন সর্ব্বদা সাধ্য বস্তুতে লগ্ন থাকে, পূর্ব্বের ন্যায় বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায় না। জগতের কোন ঐশ্বর্য্য-সুখ অথবা মান-সম্মান সাধককে আকর্ষণ করিতে পারে না। ঐ অবস্থায় একটি অপূর্ব্ব আনন্দের আস্বাদন সর্ব্বদার জন্য সাধককে নিজের মধ্যে ডুবাইয়া রাখে। বস্তুতঃ সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে ঐ আনন্দের আর তুলনা নাই। শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা সাধককে আর অভিভূত

করিতে পারে না। তখন ক্ষোভ বা ভয় অথবা সকল প্রকার বিকার সাধকের হৃদয় হইতে অপসারিত হইয়া যায়—বস্তুতঃ সব বৃত্তিই তাহার থাকে, কিন্তু তাহার অধীনভাবে—দাসরূপে। সাধকের উপর উহাদের কোন প্রভুত্ব থাকে না। সাধক ইচ্ছা করিলে উহাদিগকে জাগাইয়া উহাদের সহিত খেলা করিতে পারে।

এই সময় ভক্ত ইচ্ছাময় এবং স্বতন্ত্র, অথচ নিত্য ভগবৎ-সঙ্গের সঙ্গী এবং তাঁহার ভাবে ভাবিত। তখন তাহার মধ্যে অতুলনীয় শক্তির বিকাশ হয়। যদিও ইহা প্রকাশের বিষয় নহে, তথাপি সাধক নিজেকে তখন ভগবানের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্ত্তৃত্বসম্পন্ন বলিয়া অনুভব করে। নিয়তির পারতন্ত্র্য অথবা অন্য কোন খণ্ডশক্তির অধীনতা তাহার আর থাকে না। তখন ভক্ত ভগবানের সঙ্গে সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৭)

কিন্তু যদিও ভক্ত ভগবানের সমতা লাভ করে তথাপি ভক্ত বিশুদ্ধ অভিমানের দ্বারা নিজেকে দাস বলিয়া অভিমান করে, প্রভু বলিয়া করে না। তখন ভক্তের আত্মা ও ভগবানের আত্মা একই অভিন্ন আত্মস্বরূপে প্রকাশমান হয়। তথাপি ভক্ত ব্যবহার-ভূমিতে আরোপিত ভেদ বা আহার্য্যভেদ অবলম্বন করিয়া দাস-প্রভু ভাব অক্ষুন্ন রাখে। সাধক তখন এক অদ্বিতীয় নিত্যানন্দময় বস্তু, তাই নিজেকে সর্ব্বরসের আশ্রয় বলিয়া বুঝিতে পারে। এই অবস্থায় বিশুদ্ধ অদ্বৈতভূমিতে স্থিতি হয় বলিয়া যোগী ভক্ত ইচ্ছা করিলে নিজের আস্বাদ

নিজে গ্রহণ করিতে পারে। ইচ্ছা না করিলে যেমন আছে তেমনি থাকে। ইচ্ছার দিক্‌টা নিত্য এবং ইচ্ছা না করার দিক্‌টাও নিত্য, উভয়ই সমরূপে তখন স্থিত হয়।

যদি ইচ্ছার উদয় হয় তাহা হইলে ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে আত্মার হ্লাদিনী শক্তি প্রকট হন। ইনি আত্মার স্বরূপশক্তি, যাঁহার দ্বারা আত্মা নিজের আনন্দ নিজে আস্বাদন করেন। কৃষ্ণভক্তগণের পরিভাষাতে ইঁহারই নাম রাধা, রাম উপাসকগণের দৃষ্টিতে ইঁহার নাম সীতা। হ্লাদিনী যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকট না হন ততক্ষণ ইচ্ছার উদয় হয় না। হ্লাদিনী প্রকট হইলে রমণের জন্য সাকার ও নিরাকার উভয় সত্তার যোগ হয়। সাকার ও নিরাকার যুক্ত না হইলে আত্মারাম অবস্থা লাভ হয় না। জ্যোতি অথবা পুরুষ নিরাকার, আধার অথবা প্রকৃতি সাকার। হ্লাদিনী শক্তির ক্রিয়া ব্যতীত পুরুষ ও প্রকৃতি পরস্পর মিলিত হইয়া আত্মারাম স্বরূপে স্থিতি লাভ করিতে পারে না। হ্লাদিনীর স্বভাব অত্যন্ত শীতল। ইহার ক্রিয়া সর্ব্ব প্রকার আনন্দের মূল প্রস্রবণ। এইবার হ্লাদিনী সহকারে পুরুষ-প্রকৃতির যোগের ফলে পূর্ণ আত্ম-স্বরূপে প্রতিষ্ঠা হইল। ইহাই যথার্থ অদ্বৈত অবস্থা, যাহার নামান্তর সচ্চিদানন্দ। পূর্ব্বে প্রাথমিক আত্মদর্শন প্রসঙ্গে যে আত্মার কথা বলা হইয়াছে তাহা প্রকৃতি-বিযুক্ত আত্মা বা রিক্ত আত্মা। এখন যে আত্ম-স্বরূপের কথা বলা হইল তাহা প্রকৃতি-যুক্ত আত্মা বা পূর্ণ আত্মা।

পূর্ণ আত্মা এক। যখন এই মূল এক স্বরূপে স্থিতি হয় তখন অভেদ অথবা অদ্বৈত স্থিতি বলা চলে—ইহা লীলাতীত

স্বরূপ-স্থিতি। ইহা পূর্ণ—পূর্ণ বলিয়াই অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ-নির্গমের ন্যায় স্বভাবতঃ ইহা হইতে ভেদের আবির্ভাব হইতে থাকে। ইহাই তাঁহার নিজ শক্তির খেলা। এই ভেদাংশের আবির্ভাব অভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই এক হিসাবে ইহাকে ভেদাভেদ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহাই নিত্য লীলার ধারা।

আর একটি ধারা আছে—এই ধারাতে নিজ স্বাতন্ত্র্যবলে অভেদ বা অদ্বৈত নিজেকে গোপন করিয়া দ্বিতীয় রূপে প্রকাশিত হন। এই ধারাতে অভেদভাব গুপ্ত অথবা বিস্মৃত থাকে বলিয়া এইটি সংসারের ধারাতে পরিগণিত হয়। পূর্ণ হইতে কলার আবির্ভাব হইয়া অহং-জ্ঞানের উদয় হয়। ইহাই দ্বৈত ধারার বা সংসার-ধারার মূল প্রসূতি। হ্লাদিনী শক্তি ষোড়শী-কলা-রূপা অমৃত-কলা, কিন্তু অহং-জ্ঞান ষোড়শী কলা হইতে হয় না—খণ্ড-কলা হইতে হয়। কারণ কলা যেখানে পূর্ণ সেখানে প্রকাশও পূর্ণ। প্রকাশ পূর্ণ বলিয়া সেখানে অহং-জ্ঞানের উদয় হয় না, অর্থাৎ অহংকার জন্মে না। যাহা আছে তাহা পরিপূর্ণ অহংভাব, অহংকার নহে। অহংকার থাকিলে তাহার প্রতিযোগিরূপে ইদং ভাবের সত্তা থাকে। অহংকার হইতে অজ্ঞান অথবা মোহ আবির্ভূত হইয়া পুরুষকে মোহিত করে ও জ্যোতিকে ঢাকিয়া ফেলে। তখন ঐ মোহগ্রস্ত পুরুষ কর্মাধীন হইয়া নিরন্তর চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে থাকে। তাহার পর সদ্গুরু-কৃপাতে তত্ত্বদর্শন হইলে সাধন-পথে চলিতে থাকে ও ক্রমশঃ সাধন-সম্পন্ন করিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদয়ের পর সিদ্ধিলাভ করে ও অখণ্ড সুখের অধিকারী হয়।

(৮)

আনন্দের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলে জানিতে পারা যায় যে সংক্ষিপ্তভাবে আনন্দকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে—প্রথমটি ব্রহ্মানন্দ, দ্বিতীয়টি ভজনানন্দ ও তৃতীয়টি জীবানন্দ। ব্রহ্মানন্দ অখণ্ড আনন্দ স্বরূপ, কিন্তু তাহাতে কোন আস্বাদন নাই; কারণ নিজেকে নিজ হইতে কিঞ্চিৎ বিভক্ত না করিলে আস্বাদন করা যায় না। জীবানন্দে আস্বাদন আছে, কিন্তু উহা পরিমিত ও বিনশ্বর। এই আনন্দের ক্রমিক বৃদ্ধি আছে, কিন্তু পরাকাষ্ঠা নাই। বস্তুতঃ এই আনন্দ স্বরূপ-দৃষ্টিতে ভোগানন্দ বলিয়া দুঃখেরই অন্তর্গত। আরোপ সাধকগণ বলেন, জীবানন্দ সর্ব্বদা হেয়, তাঁহাদের মতে ব্রহ্মানন্দও উপাদেয় নহে। তাঁহারা ভজনানন্দকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করেন। ব্রহ্মে লীন জীবের আনন্দ—আমের আঁটির সঙ্গে তুলনীয়, জীবানন্দ আমের ত্বক্ বা ছালের সহিত তুলনীয়, প্রকৃত রসাস্বাদন যাহা তাহা আঁটিতে নাই, ছালেও নাই, তাহা আছে উভয়ের মধ্যে। উহাই রসবস্তু। বুদ্ধিমান্ সাধক দুই প্রান্তের দুটিকে ত্যাগ করিয়া মধ্যের রসবস্তুটি গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ বীজেও রস নাই, ছালেও নাই। ভজনানন্দ প্রেম—তাহাই আস্বাদনের বস্তু।

সাধক পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে পূর্ণ কলা সম্পন্ন হইয়া নিজেকে আস্বাদন করিবার জন্য নিজে অভিন্ন অখণ্ড স্বরূপে স্থিত থাকিয়াও নিজ হইতে নিজেকে ভিন্ন করিয়া লয়। তখন প্রভু চান দুইয়ে এক হইয়া এক-স্বরূপে স্থিত থাকিতে, কারণ বস্তুতঃ সত্তা ত একই; কিন্তু দাস প্রভুর সঙ্গে এক হইতে চায় না, সে জানে যে

যদিও উভয়ের সত্তা একই সত্তা তথাপি সে নিজে ভিন্ন থাকিয়া প্রতিক্ষণে উন্মেষ এবং নব নব সুখ যাঁহার দর্শন হইতে স্ফূরিত হয় তাঁহারই সাক্ষাৎকার চায়। সে স্বরূপতঃ সনাতন জানিয়াও প্রতিক্ষণে নব নব-নিত্য নবীন-আকাঙ্ক্ষা করে। সে ব্রহ্মে লীন হইতে চায় না, প্রভুর সহিত সমান হইতেও চায় না। সে যাহা চায় তাহা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ভাষায় ইহাই—'সত্যপি ভেদাঽপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।' তখন দাস-ভাব দাসী-ভাবে পরিণত হয়, সে দেখে এক অদ্বৈত পুরুষ—বাকী সব প্রকৃতি, দাসী। জীব ও অজীব সবই প্রকৃতি। সকল দেহে একই মাত্র পুরুষ বিরাজমান। দেহই প্রকৃতি। অথবা সে দেখে এক অখণ্ড অদ্বৈত মা বা মহাশক্তি, বাকী সবই তাঁহার সন্তান—শিব ও তাঁহার সন্তান, জীবও তাঁহার সন্তান। আসল কথা, সে দেখে যে একই অদ্বৈত আত্মা স্বয়ং বিরাজমান। তিনি এক হইয়াও অনন্তরূপে ও অনন্তভাবে নিজের সহিত নিজে খেলা করিতেছেন। এই একের মধ্যে তাঁহার সর্ব্বভেদের সমন্বয় হইয়া যায়। ইহাই আরোপ সাধনার চরম সিদ্ধি।

বাবা বিশুদ্ধানন্দ স্মৃতি

শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত, এম-এ, বি-এল।

আমি পণ্ডিত নহি, সাধক নহি, এমন কি বাবার শিষ্যও নহি। কাজেই বাবার সম্বন্ধে কিছু বলিবার আমার অধিকার নাই। যদি পণ্ডিত হইতাম তবে অধ্যাত্মশাস্ত্র মন্থন করিয়া সূত্রাকারে লব্ধ বাবার তত্ত্বকথাগুলিকে কোন বিশিষ্ট চিন্তাধারার সহিত যুক্ত করিয়া সুধীসমাজে উপস্থিত করিতে পারিতাম। যদি অনুভূতি-সম্পন্ন সাধক হইতাম তবে হয়ত বাবার যে সকল বিভূতি প্রত্যক্ষ করিয়াছি উহার কোন্‌টি সাধন বা সিদ্ধির কোন অবস্থায় মুকুলিত হইয়া উঠে তাহা বিস্তার করিয়া বলিতে পারিতাম। যদি শিষ্য হইতাম তবে বাবার সম্বন্ধে কত কিছুই না বলিবার থাকিত! কারণ শিষ্যের জীবন সদ্‌গুরুর লীলানিকেতন। উহাকে পরমপদের যোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য এখানে তাঁহার কতভাবেই না ভাঙ্গা-গড়ার কাজ চলিতে থাকে। যেহেতু উপর্য্যুক্ত কোন অধিকারেই আমি অধিকারী নহি এ অবস্থায় আমার পক্ষে বাবার সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তবুও যে ঐ সম্বন্ধে কিছু বলিতে সাহসী হইয়াছি উহা শুধু কৃতজ্ঞ অন্তঃকরণের প্রেরণা হইতে। কারণ আমি শিষ্য না হইয়াও বাবার, নিকট শিষ্যাধিক স্নেহ লাভ করিয়াছি, বিপদে অভয় পাইয়াছি, রোগ-যন্ত্রণায় বিভ্রান্ত হইয়া তাঁহার অযাচিত

করুণাপাতে নিরাময় হইয়া উঠিয়াছি। তাহা ছাড়া, সদ্‌গুরুর লীলাস্মরণেও নাকি মনের মলিনতা কাটিয়া যায়।

বাবার সহিত পরিচয় আমার দীর্ঘ দিনের নয়। তাঁহার মর্ত্ত্য-লীলা সম্বরণের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার দর্শনলাভের সৌভাগ্য আমার হয়। সেই সময় হইতে কখনও একযোগে দীর্ঘ সময়ের জন্য তাঁহার সঙ্গলাভ আমার হইয়া উঠে নাই। শারদীয় পূজাবকাশে ৺কাশীধামে এবং গ্রীষ্মের সময় কলিকাতায় কখনও কখনও বাবার দর্শনলাভ করিয়াছি। কলিকাতা হইতে ৺কাশীধামেই বাবার সঙ্গ বেশী পাইয়াছি এবং লক্ষ্য করিয়াছি যে ঐখানকার পরিবেশের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকিত যাহার জন্য বাবার লীলা-মাধুরী ঐখানে যেভাবে ফুটিয়া উঠিত তাহা অন্যত্র দেখা যাইত না। ৺কাশীধামের প্রতি বাবারও যে একটু পক্ষপাতিত্ব ছিল তাহা অনেক সময় তাঁহার বাক্যে এবং ব্যবহারে প্রকাশ হইয়া পড়িত। একবার আমি বাবাকে বলিয়াছিলাম, "বাবা, আপনার শরীর ত এখন একটু ভাল দেখিতেছি। কলিকাতায় যাহা দেখিয়াছিলাম উহা হইতে এখন অনেকটা ভাল।" বাবা বলিলেন, "কাশী যে মুক্তির স্থান, এখানে শরীর ভাল হইবে না ?"

কাশী এবং কলিকাতা উভয় স্থানেই বাবার নিকট লোক-সমাগম বেশ হইত, যদিও ইহাদের মধ্যে শিষ্যের সংখ্যাই বেশী থাকিত। এই সময় তিনি আমাদের সহিত যে সকল বাক্যালাপ করিতেন তাহাতে তত্ত্বালোচনার প্রাচুর্য্য দেখা যাইত না। আমাদের মধ্যে কেহ ঐ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেও বাবা উহার সংক্ষিপ্ত-

ভাবে উত্তর দিতেন। কারণ আমাদের অধিকাংশের নিকটেই যে তত্ত্বালোচনা কল্পনাবিলাস মাত্র তাহা বাবার অবিদিত ছিল না। সাধনবিমুখ মন তত্ত্বালোচনার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে অক্ষম। সেইজন্য উলুবনে মুক্তা ছড়াইবার উৎসাহ বাবার মধ্যে কখনও দেখা যাইত না। তিনি অনেক সময় বলিতেন, "যদি তত্ত্বালোচনা শুনিতে চাও তবে গোপীনাথের কাছে যাও, যদি কিছু প্রত্যক্ষ করিতে চাও তবে আমার কাছে এস।" কিন্তু তাই বলিয়া যে তিনি তত্ত্বালোচনা মোটেই করিতেন না একথা বলা যায় না। কারণ বাবার প্রধান শিষ্য "পরম পণ্ডিত এবং পরম জ্ঞানী" মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় যখন আসিতেন তখন বাবাকে তাঁহার সহিত তত্ত্বালোচনা করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু ঐ সকল আলোচনার মর্ম্ম গ্রহণ করা সাধারণের পক্ষে দুরূহ ছিল। উহা এমনি সংক্ষিপ্তভাবে হইত যাহা শুনিয়া অনেক সময় মনে হইত যে উহা বোধ হয় কোন সাঙ্কেতিক ভাষার সাহায্যে নিষ্পন্ন হইতেছে। শব্দগুলি আমার কর্ণকুহরে পৌঁছিত সত্য, কিন্তু ঐখান হইতে মস্তিষ্কে প্রবেশের পথ না পাইয়া উহা কর্ণান্তর দিয়া নির্গত হইয়া যাইত। প্রাপ্তির দিক্ হইতে বিচার করিলে আমার কাছে উহাতে রিক্ততা বই আর কিছু মিলিত না। কিন্তু তাই বলিয়া তৃপ্তির দিক্ হইতে উহাকে শূন্যতাও বলা চলিত না। বিরাট্ এবং মহান্ কিছুর সম্মুখীন হইলে মন যেমন স্বতঃই হর্ষ ও বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া পড়ে, গুরু-শিষ্যের ঐ আলোচনাও আমাদের মধ্যে অনুরূপ ভাব সৃষ্টি করিত। একদিনের কথা বলিতেছি—অপরাহ্ন কাল।

বিজ্ঞান-মন্দিরের দোতলার বারান্দায় বাবার সম্মুখে আমরা বসিয়া আছি। গোপীবাবুও আমাদের মধ্যে আছেন। নানা কথা প্রসঙ্গে বাবা বলিলেন, "মানুষ কখনও ভগবান্ হইতে পারে না। গোপীনাথ, তুমি কি বল ?"

গোপীবাবু। সে ত সত্য কথা।

বাবা। 'সোঽহম্' কথাটাও দ্বৈত বোধক—সে ও আমি, দুই ত রহিয়া গেল।

গোপীবাবু। তাহা ত যথার্থ-ই।

ইহার পরই গুরু-শিষ্যের মধ্যে প্রকৃতি বিকৃতি ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হইল যাহার একটি বর্ণও আমার বোধগম্য হইল না। আমি অবাক্ হইয়া গুরু-শিষ্যের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। মাঝে মাঝে উপস্থিত কাহারও কাহারও মুখের ভাবও লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। কিন্তু সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইল প্রজ্ঞাহীন কুঞ্চিত দৃষ্টি রহস্য-উদ্ঘাটনের অবিসংবাদিত ব্যর্থতা।

যাহা হউক, কিছুক্ষণ ঐভাবে আলোচনা চলিলে পর বাবা ডাঃ শোভারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শোভারাম, তুমি কি বল ?" ডাঃ শোভারাম এতক্ষণ বাবার শরীরের দিকেই তাকাইয়া ছিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, "বাবা, আমি ত এতক্ষণ আপনার পেটই লক্ষ্য করিয়াছি।" উত্তর শুনিয়া আমরা সকলেই হাসিয়া উঠিলাম। বাবা হাসিয়া বলিলেন, "তোমার কথা শুনিয়া আমার একটা গল্প মনে পড়িতেছে—

—একবার দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে এক আঁফিমখোর প্রতিমা দর্শন করিতে গিয়া "আস্তীকস্য মুনের্মাতা" বলিয়া স্তব আরম্ভ করিল।

তাহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া ঐখানকার লোকেরা তাহাকে বলিল, "বেটা, এত দেবদেবী উপস্থিত থাকিতে তুই সাপের স্তব করিতেছিস কেন?" সে উত্তর করিল, "তোমরা সকল বিষয় জান না বলিয়াই এইরূপ প্রশ্ন করিতেছ। যদি জানিতে তবে আর ওরূপ বলিতে না। তবে, শুন, আমি প্রকৃত ঘটনা বলিতেছি—গত রাত্রিতে আফিং খাইতে গিয়া দেখি যে কৌটাতে আফিং নাই বলিলেই চলে। যেটুকু ছিল উহা মুখে ফেলিয়া দিয়া ভাবিলাম যে এইবার কৈলাসে গিয়া কিছু সিদ্ধি যোগাড় করিয়া আনি। এই ভাবিয়া তখনই কৈলাসের পথে রওনা হইলাম। অনেক পরিশ্রমের পর কৈলাসে পৌঁছিয়া যখন কৈলাসপতির বাড়ীতে ঢুকিতে যাইতেছি তখন এক বিরাট্ পুরুষ আসিয়া আমার গলা টিপিয়া ধরিল এবং বলিল, "তুই কে? এখানে কি চাস্?" আমি অতি কষ্টে বলিলাম, "আমি সিদ্ধিখোর। এখানে একটু সিদ্ধির জন্য আসিয়াছি।" ইহা শুনিয়া সে আমার গলা ছাড়িয়া দিল এবং আমাকে বসিতে বলিল। পরে কতকগুলি সিদ্ধি আনিয়া আমাকে খাইতে দিল। সাহস পাইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কে?" সে উত্তর করিল, "আমি নন্দী।" নন্দীর সঙ্গে প্রাণ ভরিয়া সিদ্ধি খাইলাম। কিছুক্ষণ পর নন্দী চলিয়া গেলে আমি আবার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতেছি এমন সময় অন্য একজন আসিয়া আমাকে বাধা দিয়া আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। আমি নন্দীকে যাহা বলিয়াছিলাম তাহাকেও তাহাই বলিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে সে ভৃঙ্গী। ভৃঙ্গীর সহিতও

প্রচুর পরিমাণে সিদ্ধি ভক্ষণ করা হইল। পরে তাহাকে অনুনয় করিয়া বলিলাম, "ভাই, এত দূর দেশ হইতে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া কৈলাসে আসিলাম, একবার মা বাবাকে কি দেখিতে পাইব না? তুমি দয়া করিয়া একবার তাঁহাদের সহিত আমার দেখা করাইয়া দাও না?" ভৃঙ্গী বলিল, "বাড়ীর ভিতরে বড় গণ্ডগোল! আচ্ছা, তুমি সাবধানে আমার সঙ্গে এস। দূর হইতেই বাবাকে দেখিয়া চলিয়া যাইও। সাবধান, কাছে যাইতে চেষ্টা করিও না। "যে আজ্ঞা" বলিয়া আমি তাহার সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। একটি কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া বাবা ও মাকে দেখিলাম এবং তাঁহাদের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল তাহাও শুনিতে পাইলাম। বাবা মাকে বলিতেছিলেন "এবার পূজায় তুমি বাংলাদেশে যাও।" মা বলিলেন, "তাহা হয় কেমন করিয়া? আমাকে যে ঐ সময় ইন্দ্রালয়ে যাইতে হইবে।" বাবা তখন কার্ত্তিক, গণেশ প্রভৃতিকে একে একে বাংলাদেশে গিয়া পূজা গ্রহণ করিতে বলিলেন; কিন্তু সকলেই একটা না একটা ওজর দেখাইয়া অস্বীকার করিলেন। শেষে বাবা সাপকে বলিলেন, "তবে, বাপু, তুমিই যাও।" সাপ বলিল, "আমি আপনার ভৃত্য। আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। এবার পূজায় আমিই বাংলাদেশে যাইব।" এই কথা শুনিয়া আমি কৈলাস হইতে চলিয়া আসিলাম। এখন বুঝিলে ত এবার পূজায় দেবদেবী কেহই আসেন নাই, আসিয়াছে শুধু সাপ। সেইজন্যই ত আমার এই স্তব।"—

এই গল্প বলিয়া বাবা বলিলেন, "আমাদের এত ভাল ভাল

কথা হইল শোভারাম তাহা কিছুই লক্ষ্য করিল না, সে লক্ষ্য করিল শুধু আমার পেট !"

বাবার কথা শুনিয়া আমরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম।

তত্ত্বালোচনার দিক্ হইতে বাবা আমাদিগকে বিশদভাবে কিছু না বলিলেও আমাদের পক্ষে যাহা একান্ত প্রয়োজনীয় সে সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বদাই আমাদিগকে উপদেশ দিতেন। অধ্যাত্মজীবন লাভ করিতে হইলে সরলতা, সত্যনিষ্ঠা এবং পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির যে একান্ত প্রয়োজন তাহা তিনি আমাদিগকে একাধিকবার বলিয়াছেন। এবং নিজ জীবনের ঘটনা হইতে দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়া আমাদিগকে ঐ পথে চলিতে উৎসাহিত করিতেন।

বাবার মাতৃভক্তি একটি দর্শনীয় বস্তু ছিল। কাশীর বিজ্ঞান-মন্দিরের হল ঘরে যখনই তিনি প্রবেশ করিতেন তখন ঐখানে দেওয়ালের গাত্রে রক্ষিত মায়ের প্রতিমূর্ত্তিকে প্রণাম না করিয়া কখনও আসন গ্রহণ করিতেন না। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, "জগতে যদি কোন নিঃস্বার্থ ভালবাসা থাকে তবে উহা মায়ের। অন্য সকলের ভালবাসার মধ্যে অল্পাধিক স্বার্থগন্ধ আছে ; কিন্তু মায়ের স্নেহ একেবারেই বিশুদ্ধ।" তিনি নিজ জননীর কথা বলিতে বলিতে একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "ছোটবেলা হইতেই আমি মাকে ভক্তি করিতাম। দেবদেবীকে আমি বড় গ্রাহ্য করিতাম না, কারণ সব ছিল আমার মা। মা যখনই যাহা করিতে বলিতেন আমি উহা নির্ব্বিচারে পালন করিতাম। জীবনে একদিন মাত্র মাকে উপদেশ দিতে গিয়াছিলাম—একবার

একটি লোককে মা কিছু টাকা ধার দিতে যাইতেছিলেন। উহা দেখিয়া আমি বলিয়াছিলাম, "মা, ইহাকে টাকা ধার দিলে টাকাগুলিই নষ্ট হইবে। কারণ ধার শোধ করিবার উহার সামর্থ্য নাই।" মা কিন্তু আমার কথা গ্রাহ্য না করিয়াই লোকটিকে টাকা ধার দিলেন। উহা দেখিয়া এবং মাকে অযাচিতভাবে উপদেশ দিয়াছি বলিয়া আমার বড় অনুতাপ হইল। আমি উহা সহ্য করিতে না পারিয়া মায়ের চরণে পড়িয়া বলিলাম, "মা, আমার বড় অপরাধ হইয়াছে। আমি তোমার কার্য্যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছি, তোমাকে উপদেশ দিতে গিয়াছি। তুমি আমাকে শাস্তি দাও। তাহা না হইলে আমার দুঃখ যাইবে না, আমার মনও প্রবোধ মানিবে না।" মা আমার কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, চান্দ্রায়ণ কর।" আমিও ঐ প্রায়শ্চিত্ত করিলাম। ইহার পর আর কখনও মাকে উপদেশ দিতে যাই নাই। নির্ব্বিচারে তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছি এবং দেখিয়াছি যে উহাই সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলজনক। যে লোকটিকে মা টাকা ধার দিয়াছিলেন কিছুদিন পর সে অনেক জিনিষ-পত্র আনিয়া ধার শোধ করিয়া গেল। মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, তোর টাকায় কত জিনিষ আসিয়াছে।"

সরলতা এবং সত্যনিষ্ঠার কথা বলিতে গিয়া একদিন বাবা বলিয়াছিলেন, "পূর্ব্বে আমি (মহাকবি) কালিদাস অপেক্ষা কম বোকা ছিলাম না। কালিদাস যে ডালে বসিয়াছিল সেই ডালই কাটিতে গিয়া নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছিল। আমি কিন্তু উহা হইতে এক ডিগ্রী উপরে উঠিয়াছিলাম। একবার

আমরা কয়েকজন সন্ন্যাসী বিন্ধ্যাচলে ছিলাম। একদিন দেখিতে পাইলাম যে পাহাড়ের উপরে একটি আমগাছে একটি মাত্র আম পাকিয়া আছে। আমাদের সকলের দৃষ্টিই ঐ আমটির উপর,—উহা হস্তগত করিবার জন্য আমরা দৌড়াইয়া গিয়া গাছে উঠিলাম। সকলের আগে আমটি দখল করিবার জন্য আমি অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া ডাল হইতে লাফাইয়া গিয়া আমটি ধরিলাম। ফল যাহা হইল তাহা ত' সহজেই অনুমেয়। হাতের আম হাতেই রহিল। আমি উঁচু পাহাড় হইতে একেবারে ভূমিসাৎ হইলাম। পড়িবার সময় কিছুক্ষণ জ্ঞান ছিল, পরে আর জ্ঞান ছিল না। যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল তখন দেখিতে পাইলাম যে দাদা গুরুদেব (শ্রীমৎ ভৃগুরাম স্বামী) আমাকে শূন্যমার্গে বিন্ধ্যাচলের পাহাড়ের উপর লইয়া যাইতেছেন। দাদা গুরুদেবকে দেখিয়া একটু ভয় হইল। তিনি আমাকে ঐখানে বসাইয়া মূর্খ বলিয়া গালি দিলেন। মূর্খ যে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? কাজেই চুপ করিয়া রহিলাম। তিনি আমাকে আমটি খাইতে বলিলেন। আমি প্রথমে অস্বীকার করিলাম। তিনি বলিলেন, "ঐ আমের জন্যই ত এত কাণ্ড! উহা খাইয়া ফেল।" আমি তাহাই করিলাম। পাহাড় হইতে পতনের ফলে আমার গা এবং উরুদেশের অনেক স্থান কাটিয়া গিয়াছিল। উহাতে লাগাইবার জন্য তিনি আমাকে ঔষধ দিয়া বলিলেন, "বল্, এরূপ কাজ আর কখনও করিবি না।" আমি বলিলাম, "কেন করিব না? আমি আরও করিব।" তিনি অবাক হইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহাকে

ঐভাবে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া আমি বলিলাম, "আমি ঐরূপ কাজ কেন করিব না ? আমার হইয়াছে কি ? তুমি থাকিতে আমার ভয় কিসের ?" দাদা গুরুদেব সন্তুষ্ট হইয়া আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন।"

দাদা গুরুদেবের স্নেহের কথা বলিতে বলিতে বাবা আবার বলিতে লাগিলেন, "ছোটবেলা হইতেই সত্যের প্রতি আমার অনুরাগ ছিল। মিথ্যা কথা আমি বলিতে পারিতাম না। সেইজন্য দাদা গুরুদেব আমাকে খুব স্নেহ করিতেন। জ্ঞানগঞ্জে একদিন স্নান করিতে যাইতেছি, সেই সময় একটি কুমারীকে স্নান করিতে দেখিয়া আমার চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। আমি আর স্নান না করিয়া তখনই দাদা গুরুদেবের নিকট চলিয়া গেলাম। তিনি আমাকে অসময়ে আসিতে দেখিয়া একটু হাসিলেন। আমি কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া গম্ভীরভাবে আমার মনের শোচনীয় অবস্থা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিয়া বলিলাম, "হয় আমাকে এই পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করুন, না হয় আমাকে আশ্রম হইতে তাড়াইয়া দিন। আমার মত লোক এখানে থাকিবার উপযুক্ত নয়।" দাদা গুরুদেব হাসি-হাসি মুখে বলিলেন, "আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি আজ হইতে তোমার কাম-ভাব আর জাগিবে না। যদি জাগে তবে জগৎ ধ্বংস হইবে।" ইহা বলিয়া তিনি আমাকে একটি প্রক্রিয়া দেখাইয়া দিলেন এবং উহা অভ্যাস করিতে বলিলেন। দাদা গুরুদেবের শক্তির তুলনা নাই। দেবতারাও তাঁহার ভয়ে কম্পিত।"

দিব্যজীবন লাভের পক্ষে খাদ্যাখাদ্যের বিচার যে প্রয়োজনীয়

তাহাও বাবা আমাদিগকে বলিতেন। তিনি সৎসঙ্গের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিতেন। আহার নিদ্রা হ্রাস করিতে উপদেশ দিতেন। বাবা বলিতেন, "কর্ম্ম না করিলে ফল হয় না। সাধন বিষয়ে যে যত কর্ম্ম করিবে সে তত শীঘ্র শীঘ্র ফল পাইবে। তবে সর্ব্ব প্রথম চাই চরিত্র। চরিত্র ভাল না থাকিলে কিছুতেই কিছু হইবার নয়। অল্পাহার অল্পনিদ্রা ভাল। ক্রিয়া করিতে করিতে উভয়ই হইয়া যায়। সর্ব্বদা ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে না পারিলে শান্তি কোথায়? আর ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া থাকিলে শান্তি অবধারিত।"

গল্পচ্ছলে বাবা আমাদের সাধন-বিমুখতা ও উৎসাহ-শূন্যতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেন। একদিন বাবা এই গল্পটি বলিলেন—"এক বৃদ্ধা বিধবা ছিল। তাহার অগাধ ধনসম্পত্তি। সে উহা লইয়াই দিবারাত্র মত্ত থাকিত এবং ঐ জন্য রাত্রিতেও তাহার ঘুম হইত না। নিদ্রার অভাবে তাহার দেহ দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল এবং মেজাজটিও রুক্ষ হইতে লাগিল। এইজন্য কি আত্মীয়, কি অনাত্মীয় সকলকেই সে জ্বালাতন করিতে লাগিল। যাহাতে ঘুম হয় তাহার জন্য চিকিৎসা ও ঔষধ-পত্র কত কিছু করিল, কিন্তু সবই ব্যর্থ হইল। নিদ্রার অভাবে সে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া তাহার এক আত্মীয় একদিন তাহাকে একটি জপের মালা দিয়া বলিল, "তুমি সকালে এবং সন্ধ্যাবেলায় ভগবানের নাম করিয়া এই মালা জপ করিও; ইহাতে তুমি মনে শান্তি পাইবে এবং তোমার শরীরও সুস্থ হইয়া উঠিবে।" ঐ আত্মীয়ের কথামত বৃদ্ধা

একদিন সন্ধ্যাবেলা জপের মালা লইয়া নাম করিতে বসিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে এতদিন শত চেষ্টা করিয়াও ঘুমাইতে পারে নাই, সে ঐ দিন মালা জপ আরম্ভ করা মাত্র নিদ্রায় ঢলিয়া পড়িল। ইহার পর হইতে যখনই সে নিদ্রার অভাব বোধ করিত তখনই চীৎকার করিয়া বলিত, "ওরে, আমার ঘুমের মালাটা নিয়ে আয় ত।" এই গল্প বলিয়া বাবা আমাদিগকে বলিলেন, "তোমাদের অবস্থাও ঐ বৃদ্ধার মত। সংসারের যাবতীয় কাজ করিতে তোমাদের ক্লান্তি নাই, যেই নাম জপের সময় আসিল আর অমনি তোমরা অবসন্ন হইয়া পড়িলে।" এই গল্প শুনিয়া আমরা সকলেই খুব হাসিতে লাগিলাম। বাবাও আমাদের সঙ্গে হাসিতে লাগিলেন।

কোন কোন শিষ্যের দুর্ব্বলতা লইয়াও বাবা মাঝে মাঝে হাসি তামাসা করিতেন। কিন্তু উহাও এমনভাবে করিতেন যে সেজন্য শিষ্যেরা মনঃক্ষুণ্ণ ত হইতই না, বরং তাহাদের বিষয় লইয়া বাবা আমোদ করিতেছেন দেখিয়া তাহারাও পরম আনন্দ লাভ করিত। ব্রহ্মপদ নামে বাবার এক শিষ্য আছেন। তিনি আশ্রমের বিগ্রহাদির সেবাপূজা করিয়া থাকেন। একদিন তাঁহার সম্বন্ধে বাবা আমাদিগকে বলিলেন, "ব্রহ্মপদ দধি খাইতে ভয় পায়, কারণ উহা নাকি তাহার সহ্য হয় না। একদিন লোভে পড়িয়া সে কিছু দধি খাইয়াছিল। খাইয়াই তাহার ভয় হইল পাছে তাহার কোন অসুখ হয়। তখন সে এক গ্লাস জল খাইয়া নিজের ঘরে গিয়া লাফাইতে আরম্ভ করিল। তাহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া পরমেশ্বর (চাকর) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি একি

করিতেছেন ?” ব্রহ্মপদ উত্তর করিল, “আমি পেটের দধি ঘোল করিতেছি।”

“আর একদিন দেখি ব্রহ্মপদ বাগানের ফুলগাছের চারাগুলি একবার টানিয়া তুলিতেছে, আবার তখনই ঐগুলিকে মাটিতে পুতিয়া রাখিতেছে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “এ কি করিতেছ ?” সে বলিল, “বাবা, গাছগুলি তুলিয়া দেখিতেছি যে ঐগুলি মাটিতে লাগিল কি না।”

“কখন কখন দেখা যায় যে, সে দেওয়ালের সঙ্গে তাহার মাথা ঠুকিতেছে। তাহাকে যদি উহার কারণ জিজ্ঞাসা করা যায় তবে সে বলে, “মাঝে মাঝে আমার শ্বাসবন্ধ হইয়া যায়, তাই মাথা ঠুকিয়া আমি আবার উহাকে চালাইয়া দেই।”

“এই সকল ছিল ব্রহ্মপদের কীর্ত্তি। ইহাদের লইয়া আমাকে ঘর করিতে হয়। উহার বুদ্ধি ঐরূপ হইলেও ও কিন্তু খুব সত্যবাদী। প্রাণান্তেও মিথ্যা কথা বলে না।”

তত্ত্বালোচনা, উপদেশ এবং হাসি তামাসা ব্যতীত বাবার দরবারে কখনও কখনও রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়ের আলোচনাও হইত এবং উহা উপলক্ষ্য করিয়া বাবা মাঝে মাঝে এমন সব অভিমত ব্যক্ত করিতেন যেগুলিকে আমরা ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়াই ধরিয়া লইতাম এবং পরবর্ত্তীকালে দেখিয়াছি যে ঐ বাণীগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের কথা বলিতেছি। তখন ইতালী সবেমাত্র আবিসিনিয়া আক্রমণ করিয়াছে। ঐ সংবাদ পত্রিকায় পাঠ করিয়া আমি বাবাকে বলিলাম, “বাবা, দুই বৎসর পূর্ব্বে আপনি

বলিয়াছিলেন যে একটি যুদ্ধ বাধিলে মন্দ হইত না। এখন ত সত্যি সত্যি যুদ্ধ বাধিয়া গেল।"

বাবা। এ কিছু নয়। একটি বড় যুদ্ধ আসিতেছে উহাতে ইংরেজেরাও জড়াইয়া পড়িবে।

আমি। এ ত' বড় ভয়ের কথা! আমরাও ত' উহাতে জড়াইয়া পড়িব না ?

বাবা। না, উহার একটু বিলম্ব আছে। ইংরেজেরা মিথ্যা কথা বলিয়া আমাদিগকে আবার ঠকাইতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু পারিবে না।

পাঁচ বৎসর পর যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল তখন ঐ যুদ্ধে কংগ্রেসের সহানুভূতি ও সাহায্য লাভের জন্য ক্রিপ্স্ সাহেব যে সকল প্রস্তাব লইয়া ভারতে আসিয়াছিলেন এবং উহার ফলাফল যাহা হইয়াছিল তাহা এখন সকলেরই সুবিদিত। কিন্তু এইরূপ যে হইবে তাহা বাবা ঐ ঘটনার ৬।৭ বৎসর পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন।

কখনও কখনও সামাজিক দুর্নীতির কথাও উঠিত। সমাজ এবং ধর্ম্মক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রাবল্য দেখিয়া আমরা হতাশভাবে বাবার দৃষ্টি ঐদিকে আকর্ষণ করিলে তিনি বেশ দৃঢ়তার সহিত বলিতেন, "চিন্তার কোন কারণ নাই। ধীরে ধীরে আমরা মঙ্গলের দিকেই চলিয়াছি। হিন্দুধর্ম্ম লোপ পাইবার নয়। যাহারা ইহার বিনাশ সাধনের চেষ্টা করিবে তাহাদেরই সর্ব্বনাশ হইবে।" মনে হয় আমাদের রাষ্ট্রনায়কগণ বাবার এই কথাগুলির প্রতি যদি একটু অবহিত হইতেন তবে হয়ত তাঁহাদের মঙ্গলই হইত।

রসালাপ ব্যতীত যাহা দ্বারা জনসাধারণ বাবার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইত তাহা হইল বাবার বিভূতির খেলা। অনেকে শুধু ইহা দেখিতেই বাবার কাছে যাতায়াত করিতেন এবং বাবাও এই সব দেখাইতে কার্পণ্য করিতেন না। লোকের অনুরোধ উপরোধ ব্যতীতও বাবা অনেক সময় নিজের খেয়ালবশতঃ আমাদিগকে এই সকল দেখাইয়াছেন। অনেক সময় হাসি-তামাসার ভাবেও আমাদিগকে দুই একটি বিভূতি দেখাইয়াছেন। একদিন সকাল বেলা কাশীর আশ্রমে গিয়া দেখি যে বাবা আশ্রমের ফুলবাগানটির চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ইহাই ছিল তাঁহার নিত্যকর্ম্ম। অতি প্রত্যুষে তিনি মোটরগাড়ীতে কিছুক্ষণ বেড়াইয়া আসিয়া আশ্রমের বাগানটি নয়বার প্রদক্ষিণ করিতেন। বাবা বলিতেন, "এই বাগানটির চারিদিকে নয়বার ঘুরিলেই এক মাইল হয়।" যাহা হউক, বাবাকে ঐভাবে বেড়াইতে দেখিয়া আমরাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে লাগিলাম। ঐ বাগানে কতকগুলি মোরগ ফুলের গাছ ছিল এবং উহার ফুলগুলি ফুটিয়া বাগানখানি যেন আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল। উহা দেখিয়া আমাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "ফুলগুলি দেখিতে বেশ, কিন্তু ইহার গন্ধ নাই।" এই কথা শুনিয়া বাবা অমনি আমাদের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কি বলিলে? আশ্রমের ফুলের গন্ধ নাই?" এই বলিয়া তিনি একটি মোরগ ফুল তুলিয়া উহাকে একবার মাত্র চক্রাকারে আবর্ত্তিত করিয়া আমাদের হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখ দেখি গন্ধ আছে কি না।" আমরা আঘ্রাণ করিয়া দেখিলাম যে উহা হইতে অপূর্ব্ব গন্ধ নির্গত

হইতেছে। ইহা যে শুধু বাবার বিভূতির জন্যই তাহা আমাদের বুঝিতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হইল না।

বাবার বিভূতির অনেক খেলাই দেখিয়াছি। অনেকেই উহা দেখিয়াছেন। কাজেই উহা আর উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাই না। তবে এই বিভূতির খেলাগুলি বাবা যেভাবে দেখাইতেন এবং উহা যেরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল তাহা দেখিয়া মনে হইত যে সর্ব্বশক্তিময়ী প্রকৃতি বাবার যে কোন আদেশ পালন করিবার জন্য যেন অনুগতা দাসীর মত সর্ব্বদা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতেন।

আমরা যাহা কিছু বাবাকে সৃষ্টি করিতে দেখিয়াছি উহা সমস্তই যে বাবা যোগবলে করিতেন একথা বাবা স্বীকার করিতেন না। সূর্য্য বিজ্ঞান, বায়ু বিজ্ঞান, শব্দ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের নাম করিয়া বলিতেন যে তিনি অধিকাংশ সৃষ্টিই ঐগুলির সাহায্যে করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সকল বিজ্ঞান হইতে যোগ-বিভূতি কত দূর তাহা নির্ণয় করা আমাদের সাধ্যাতীত। একদিন বায়ু বিজ্ঞানের সাহায্যে বাবা কর্পূর তৈয়ার করিয়া আমাদিগকে দিলেন। দেখিলাম বাবা তাঁহার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীটি দুই একবার সর্পগতিতে উর্দ্ধগতিতে সঞ্চালন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই উহার অগ্রভাগে শিশিরবিন্দুর মত স্বচ্ছ একটি বিন্দুর আবির্ভাব হইল। ধীরে ধীরে উহার কলেবর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরে দেখা গেল যে একখণ্ড কর্পূর বাবার তর্জ্জনীর অগ্রভাগে লাগিয়া আছে। বাবা আমাদিগকে উহা দেখাইয়া বলিলেন, "জগতের এমন কোন শক্তি নাই যাহা এই কর্পূরের টুকরাটিকে আমার

অঙ্গুলী হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে।” এই বলিয়া তিনি বারবার সজোরে অঙ্গুলীটি ঝাড়া দিতে লাগিলেন, কিন্তু কর্পূরের টুকরাটি স্থানচ্যুত হইল না। শেষে বাবা নিজেই উহা তুলিয়া আমাদিগকে দিলেন। আমরা প্রসাদ জ্ঞানে সকলেই উহা একটু একটু করিয়া ভাগ করিয়া নিলাম। বাজারের কর্পূর হইতে যে ইহা কত উৎকৃষ্ট তাহা বলাই বাহুল্য।

এই সকল বিভূতি সম্বন্ধে বাবা আমাদিগকে একদিন বলিয়াছিলেন, “ছোটবেলা আমি বিভূতির কথা বিশ্বাস করিতাম না। ঐ সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা লেখা আছে ঐগুলিকে গালগল্প বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু জ্ঞানগঞ্জে গিয়া দেখি যে সেখানে সবই অন্যরূপ! উহা যেন এক মায়াপুরী। ঐখানে যে কি হয় এবং কি হয় না তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ঐ সকল শক্তির খেলা দেখিয়া উহা আয়ত্ত করিবার জন্য আমার দৃঢ়সঙ্কল্প হইল। যখন ঐ সকল শক্তি লাভ হইল তখন উহা লোকদিগকে দেখাইবার খুব ঝোঁক ছিল এবং দেখাইয়াছিও অনেক কিছু, যেন উহা দেখিয়া তাহাদের বিশ্বাস হয় যে আমাদের শাস্ত্র অভ্রান্ত। কিন্তু এখন আর কিছু দেখাইতে ইচ্ছা হয় না। মনে হয় ইহাতে লাভ কি?” আমাদের ভিতরে অজ্ঞান ও অবিশ্বাসের দুর্ভেদ্য প্রাচীর লক্ষ্য করিয়াই বাবা শেষ কথাটি বলিলেন কি না তাহা কে জানে?

শিষ্যদের মধ্যে কেহ কোন বিভূতি দেখিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে বাবা তাহাকে কুমারী পূজার সর্ত্তে আবদ্ধ করিয়া তবে বিভূতি দেখাইতেন। ইহা দেখিয়া আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা

করিয়াছিলাম, "বাবা, এই সকল বিভূতি দেখাইলে কুমারী পূজা করিতে হয় কেন ?"

বাবা। এ সব দেখাইলে আমার অপরাধ হয়।

আমি। বাবা, আপনার আবার অপরাধ !

বাবা। অপরাধ বই কি ? যাহারা বিশুদ্ধ বস্তু দেখিতে অধিকারী নয় আমি তাহাদিগকে উহা দেখাইতেছি। ইহাই আমার অপরাধ। হাতীর বোঝা ছাগলের ঘাড়ে চাপান অপরাধ বই আর কি ? তাহা ছাড়া যাহারা এই সকল বিভূতি দেখে তাহাদেরও অনিষ্ট হয়। এই সকল দূর করিবার জন্য আমি সমস্তই ভগবতীর ঘাড়ে চাপাইয়া দেই। তিনিই সমস্ত দোষ কাটাইয়া দেন।

এ পর্য্যন্ত বাবার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছি উহা সমস্তই বাহ্য। এগুলি বিশেষ হইলেও ইহা দ্বারা বাবার মহত্ত্ব সূচিত হয় না। যে যাদুবলে তিনি সকলের হৃদয় জয় করিয়া সেখানে রাজরাজেশ্বররূপে বিরাজ করিতেন তাহা হইল তাঁহার পারাপার-হীন অহৈতুকী কৃপা। এখানে তিনি ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ, পাপী-পুণ্যাত্মা কিছুই বিচার করিতেন না। লোকের দুঃখ দেখিলে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইয়া যাইত এবং তিনি তাঁহার অলৌকিক শক্তি প্রভাবে ঐগুলিকে যথাসম্ভব হ্রাস করিয়া উহাদিগকে সহন-যোগ্য করিয়া দিতেন। অসহায় হইয়া কেহ তাঁহার মুখপানে তাকাইলে তাহাকে বঞ্চিত হইতে হইত না। বাবার শেষ জীবনটা এইভাবে শিষ্যদের ভোগ গ্রহণ করিয়াই কাটিয়াছে এবং শেষে কোন শিষ্যের কল্যাণে নিজকে আহুতি দিয়া তাঁহার মর্ত্ত্যলীলা

পরিসমাপ্ত করিয়াছেন। ভগবানের কৃপা শক্তিকেই নাকি গুরু বলা হয়। বাবা ছিলেন পরমকারুণিক। তাই একদিন বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "বাবা, কৃপার ভাব বেশী না থাকিলে নাকি গুরু হওয়া যায় না?"

বাবা। গুরু অর্থ হইতেছে যিনি গুরু ভার গ্রহণ করিতে পারেন। শিষ্যকে শোষণ করা ত গুরুর কাজ নয়।

আর একদিন বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "বাবা, শিষ্যের সহিত আপনার সম্বন্ধ কি?"

বাবা। পিতা-পুত্র।

আমি। এ সম্বন্ধ কি আপনি যতদিন দেহে আছেন ততদিন থাকিবে, না ইহার পরেও থাকিবে?

বাবা। ইহা জন্ম-জন্মান্তরে থাকিবে। এ সম্বন্ধ শেষ হইবার নয়।

আমি। বাবা, আপনি ত কলিকাতায় আমাকে এ সম্বন্ধে অন্যরূপ বলিয়াছিলেন। আমি যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে আপনার যে সকল শিষ্য এ জন্মে মুক্ত হইবে না তাহারা কি পর-জন্মেও আপনার কৃপা পাইবে? উত্তরে আপনি বলিয়াছিলেন, "আমার কি আবার জন্ম হইবে যে পর জন্মে কৃপা পাইবে?"

বাবা। সে ত সত্যি কথা। শিষ্যকে আবার জন্মে জন্মে কৃপা করিতে হইবে কেন? চন্দ্র সূর্য্যকে কি রোজ রোজ চালাইয়া দিতে হয়? একবার মাত্র তাহাদিগকে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাতেই তাহারা চলিতেছে। সেইরূপ শিষ্যের সঙ্গে যে সম্বন্ধ

হইয়াছে তাহা চিরকাল থাকিবে। এ যে তুলার আগুন, নিভিবার নয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমি বাবার শিষ্য নহি। তবু কত ভাবে যে আমি তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। একবার পূজার সময় আমি সস্ত্রীক কাশী গিয়াছি। সেই সময় আমার শ্বাশুড়ী কলিকাতায় খুব পীড়িতা ছিলেন। হঠাৎ একদিন টেলিগ্রাম পাইলাম যে তাঁহার অবস্থা সঙ্গীন। আমি যেন অবিলম্বে স্ত্রীসহ কলিকাতা চলিয়া আসি। যে সময় এই সংবাদ আসিল তখন আমার পক্ষে কাশী ত্যাগ করা খুবই অসুবিধাজনক। একবার ভাবিলাম যে বাবাকে গিয়া বলি যে তিনি যেন কৃপা করিয়া শ্বশ্রূমাতাকে আরও কিছু দিন বাঁচাইয়া রাখেন। কিন্তু ঐ কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহস হইল না। এ জাতীয় প্রার্থনা করা সমীচীন কি না সে সম্বন্ধেও সন্দেহ জাগিল। কিন্তু বিপদে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান থাকে না। রজনী ভর মনে মনে বাবার নিকট প্রার্থনা চলিতে লাগিল। ভাবিলাম বাবা ত অন্তর্যামী, তিনি অবশ্যই ইহা শুনিতেছেন। পরদিন বিকালে আশ্রমে গেলাম। দেখিলাম বাবার সম্মুখে এক ঘর লোক বসিয়া আছেন। আমিও তাঁহাদের মধ্যে এক কোণে একটু স্থান করিয়া নিলাম। নানা প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। ইহার মধ্যে হঠাৎ বাবা আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "দেখ হে, আয়ু শেষ হইলে আর রাখা যায় না। চেষ্টা করিলে বড় জোর তিন চারি মাস রাখা যাইতে পারে।" বাবার কথাগুলি এতই অপ্রাসঙ্গিক ছিল যে ইহার অর্থ কেহই বুঝিতে পারিল না।

কিন্তু উহা লক্ষ্য স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। আমি সেইদিনই কলিকাতা টেলিগ্রাম করিয়া জানিতে চাহিলাম যে অবস্থা কিরূপ? উত্তর আসিল, কিছু ভাল। ইহার প্রায় এক সপ্তাহ পরে কলিকাতা গিয়া শ্বাশুড়ীকে পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ভালই দেখিলাম। কিন্তু তিনি আর সুস্থ হইয়া উঠিলেন না। যেদিন তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইলাম, সেদিন হিসাব করিয়া দেখিলাম যে পূর্ব্বোক্ত ঘটনার প্রায় চার মাস পর তাঁহার দেহত্যাগ হইল। যে পরমায়ুটুকু তিনি ভোগ করিয়া গেলেন তাহা বাবার কৃপার জন্যই কি না তাহা কে বলিবে?

আর এক সময়ের কথা বলিতেছি—ঢাকায় তখন হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা চলিতেছিল। অবশ্য এই দাঙ্গাগুলি ইংরেজ শাসকদের প্ররোচনায় এবং আনুকূল্যে সৃষ্ট ও পুষ্ট হইত এবং এইগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে নির্ম্মূল করা। কিছু দিন দাঙ্গা চলিবার পর উহা দমন করিবার অজুহাতে সরকার ঢাকায় গোরা সৈন্য আমদানী করিলেন। আমরা সকলেই বুঝিলাম যে ইহার উদ্দেশ্য দাঙ্গা দমন নয়, হিন্দুকে নিগ্রহ করা, কারণ ঐ জাতীয় দাঙ্গা নিবারণের জন্য আর সৈন্যের দরকার হয় না। গোরা সৈন্যদের ছাউনি পড়িল আমার বাসা হইতে অনতিদূরে, প্রায় ৫০০ গজের মধ্যে। ইহাতে আমি বিপদ গণিলাম; কারণ আমার বাসা ছিল সহরের এক জন-বিরল অঞ্চলে। এই সময় আমি কলিকাতা ছিলাম। ভাবিলাম ঢাকা ফিরিয়া গিয়া আর ঐ বাসায় উঠিব না। সৈন্যাবাস হইতে যতদূর সম্ভব দূরে কোন ঘন বসতির মধ্যে নূতন বাসা করিব?

এই সময় বাবাও কলিকাতা ছিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম একদিন গিয়া বাবাকে সমস্ত কথা বলিলাম। তিনি স্থির ভাবে আমার কথা শুনিয়া তাহার সুন্দর ডাগর চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "কোন চিন্তার কারণ নাই, যেখানে আছ সেইখানেই থাকিও।" বাবার ঐ কথার সঙ্গে সঙ্গেই আমার দোদুল্যমান চিত্ত শান্ত হইয়া গেল। পরে দেখিয়াছিলাম সৈন্যেরা অন্যত্র কোন কোন বাড়ীতে উপদ্রব করিলেও আমার বাসার চতুঃসীমানার মধ্যে আসিত না।

আর একবার স্ত্রীর অসুখের জন্য বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলাম। ঢাকাতে ইহার যতদূর চিকিৎসা করা সম্ভব তাহা করা হইল। কিন্তু রোগের কোন উপশম দেখা গেল না। ভাবিলাম কলিকাতার কোন বিশেষজ্ঞকে দেখাইয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিব। ঐ উদ্দেশ্য লইয়া পূজার ছুটিতে ঢাকা হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। হরিদ্বার, দেরাদুন, প্রভৃতি স্থান বেড়াইয়া কাশী আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানে বাবার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি কাশীতে ৪।৫ দিন থাকিয়া কলিকাতা ফিরিবার অভিপ্রায়ে বাবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে বাবা বলিলেন, "এবার ত তুমি অতি অল্প সময় কাশীতে রহিলে ?" স্ত্রীর চিকিৎসার জন্যই যে আমাকে এত শীঘ্র কলিকাতা যাইতে হইতেছে তাহা বাবাকে বলায় তিনি আমার স্ত্রীর কি অসুখ তাহা জানিতে চাহিলেন। আমি উহা নিবেদন করিলে বাবা বলিলেন, "এত দিন আমাকে ঐ কথা বল নাই কেন ? বাবার কাছে সন্তানের আবার লজ্জা কি রে ?" এই বলিয়া তখনই তিনি আমাকে দুইটি ঔষধের বড়ি

দিয়া বলিলেন, "এখনই গিয়া বৌমাকে একটি খাওয়াইয়া দাও। বিকালে উহার ফলাফল আমাকে জানাইও।" তাহাই করিলাম। একবার মাত্র ঔষধ সেবনের ফলে যথেষ্ট উপকার দেখা গেল। বিকালে ঐ কথা বাবাকে বলিলে তিনি বলিলেন যে ইহার ফল স্থায়ী করিতে হইলে একটু দীর্ঘ দিন ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি আরও কতকগুলি ঔষধ আমাকে দিলেন। ঢাকাতেও দুইবার ডাকযোগে ঔষধ পাঠাইয়া ছিলেন যাহা ব্যবহার করিয়া আমার স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন।

বাবার এই সকল অযাচিত করুণার কথা যখনই স্মৃতি-পথে উদিত হয় তখনই কৃতজ্ঞতায় দুই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে। এমন দয়াল ঠাকুর আর কোথায় পাইব ? আজিকার এই দুর্দ্দিনে বাবার অভাব যেন নূতন করিয়া নিবিড়ভাবে হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতেছে। কারণ রাষ্ট্রীয় ঝঞ্ঝাবর্ত্তে জীর্ণপত্রসম স্বদেশ ও স্বজন হইতে আজ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। বার্দ্ধক্যের করাল ছায়া জীবনকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। আশা আকাঙ্ক্ষা করিবার এখন কিছু নাই। বর্ত্তমান অনিশ্চিত, ভবিষ্যৎ ঘোর তমসাচ্ছন্ন। দুশ্চিন্তা এবং ভয় হইয়াছে এখন নিত্য সহচর। আজ নিজকে যেমন অসহায় ও দুর্ব্বল বোধ করিতেছি এমনটি আর কখনও হয় নাই। এই সময় যদি আমাদের প্রেমের ঠাকুর দেহে থাকিতেন তাহা হইলে ভয় করিবারই বা কি ছিল, ভাবনা করিবারই বা কি ছিল ? কারণ ঐ আয়ত-লোচনের কৃপা কটাক্ষের সম্মুখে দুর্দ্দৈবও যে টিকিতে পারে না !

বাবা যে নাই একথা যেমন মর্ম্মান্তিকভাবে সত্য, আবার

তিনি যে নিত্য বর্ত্তমান একথাও তেমনি সত্য। কারণ সদ্‌গুরু মৃত্যুঞ্জয়, অবিনাশী, শাশ্বত। তাঁহার চির প্রকাশ এবং চির অপ্রকাশ। তাহাই যদি না হইত তাহা হইলে তাঁহার প্রেমের লীলা এখনও চলিতেছে কিরূপে? শুনা যায় এখনও কোন কোন ভাগ্যবান্ তাঁহার পাবন-পরশ হৃদয়ে উপলব্ধি করিতেছেন, কেহ কেহ বা প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার দর্শন লাভ করিতেছেন। চতুর্দ্দিকের খণ্ড প্রলয়ের মধ্যে আমরাও যে অক্ষত শরীরে টিঁকিয়া আছি তাহাও ঐ পরমদয়ালের কৃপার জন্য কি না তাহাই বা কে বলিবে? তাই আজ শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে ঐ পতিতপাবনের চরণযুগলে সাষ্টাঙ্গ হইয়া বলিতেছি—

"হে জগৎ গুরো, তোমার জয় হউক!"

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব রচিত

গীতাবলী

রায় সাহেব শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, কবিরত্ন, এম-এ

শ্রীশ্রীবাবা বিশুদ্ধানন্দ বাল্যাবধি সঙ্গীতকুশল ও সঙ্গীত-রচনাপটু ছিলেন। জ্ঞানগঞ্জে শিক্ষাগুণে তাঁহার সঙ্গীত-পারদর্শিতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার প্রাচীনতম শিষ্যগণ অনেকেই তাঁহাকে তানপুরা সংযোগে গান করিতে ও পাখোয়াজ বাজাইতে দেখিয়াছেন। ৺উপেন্দ্র চৌধুরী লিখিয়াছেন, "সেরূপ মধুরকণ্ঠের গান আমি আর শুনি নাই। অদ্যাবধি কোথাও গান শুনিতে গেলে আর গান ভাল লাগে না। ··· ···তিনি প্রায় প্রতিরাত্রেই (গভীর রাত্রে) আপন মনে এমনি গান করিতেন, আমি মুগ্ধ হইয়া শুনিতাম। ··· ···এখনও সেই প্রকার সুমিষ্ট গান শুনাইবার জন্য অনেকবার বলিয়াছি—কিন্তু আর হয় না। বলেন, উপেন্দ্র, সে দিন আর নাই।" তিনি ১০।১১ বৎসর বয়স হইতে গীত রচনা আরম্ভ করেন। তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি তিনি তিন চারি শত গান রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেগুলি তিনি একখানে সংগ্রহ করিয়া রাখেন নাই। সাময়িক খাতাপত্রের পাতায় টুকিয়া রাখিতেন। অনেক গান শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার মুখস্থই ছিল। পুরাতন খাতা ইত্যাদি হইতে তিনি ৪৩টি গান ৺দুর্গাকান্ত রায় প্রভৃতিকে দেন। ঐ গান কয়েকটি

শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ লিখিত ভূমিকাসহ ১৩৩৯ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। তৎপর ১৩৪২ সালে শারদীয়া পূজার সময় হইতে আমি আড়াই মাস কাল কাশীতে অবস্থান কালে তিনি আমার প্রতি অসীম স্নেহ প্রদর্শন করিয়া কতক পুরাতন খাতা হইতে কতক স্মৃতি হইতে ৪০টি গান আমাকে দিয়াছিলেন। ক্রমে আরও বহু ঐভাবে পাইব আশা ছিল। কিন্তু আমি কাশী হইতে চলিয়া আসিবার পরই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে এবং আমিও একযোগে বেশী দিন তাঁহার পদপ্রান্তে বসিতে পারি নাই। যে গান কয়েকটি আমি পাইয়াছি তাহা এইভাবে ক্রমশঃ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

শ্রীশ্রীবাবা ১২৬২ সালের ২৯শে ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪ বৎসর ৩ মাস বয়সে জ্ঞানগঞ্জ যান। তথায় দুই তিন বৎসর মধ্যেই (ব্রহ্মচারি দশায়ই) তাঁহার "বিশুদ্ধানন্দ" নামকরণ হয়। এই সব কথাই আমার তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শ্রুত এবং আমার ডায়েরীতে লিখিত। তিনি আরও বলিয়াছেন, তাঁহার রচিত গানগুলির মধ্যে যেগুলিতে 'ভোলানাথ' বা 'ভোলা' ভণিতা আছে সেগুলি তাঁহার বিশুদ্ধানন্দ নাম প্রাপ্তির পূর্ব্বে (অর্থাৎ বাল্যকাল হইতে সপ্তদশ অষ্টাদশ বর্ষ বয়স মধ্যে) রচিত। বিশুদ্ধানন্দ নামকরণের পরে রচিত গানগুলিতে প্রায় "বিশে ক্ষেপা" বা "বিশে" এইরূপ ভণিতা আছে। দুই একটি গানে ভণিতা নাই-ও। একটি গান এক শিষ্যের অনুরোধে রচিত হইয়াছিল বলিয়া তাহাতে ঐ শিষ্যের নামের ভণিতা আছে। তাহা যথাস্থানে প্রদর্শন করিব। অনেকগুলি গানের রচনাকালও তিনি

আমাকে বলিয়াছেন—তাহাও যথাস্থানে প্রকাশ করিব। ৺দুর্গাকান্ত রায় প্রকাশিত গীত-সংগ্রহে ("গীত-রত্নাবলী"তে) সকল গানের অন্তেই রচনা বৎসর বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। আমাকে শ্রীশ্রীবাবা যখন গান দেন তখন ঐ পুস্তকে পূর্ব্বে প্রকাশিত গানগুলিরও অনেকটি বলেন; কিন্তু উহা পূর্ব্বে প্রকাশিত বলিয়া আর আমি তাঁহার মুখ হইতে লিখিয়া লই নাই। পুস্তকের সঙ্গেই মিলাইতাম। তখন দেখিয়াছি কতকগুলি গানের রচনা বৎসর ভুল ছাপা হইয়াছে। তাহা আমি আমার পুস্তকে সংশোধন করিয়া রাখিয়াছি। ঐ পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হইলেই ভ্রম সংশোধন সম্ভব হইবে।

(১)

মা, তোরে বলি একটা কথা।
সত্য ক'রে না বলিলে খাবে পিতামাতার মাথা।
দুর্গানামে দুর্গতি যায়
এই শুনি যথা তথা,
সত্য ক'রে বল দেখি মা
সত্য না এ কথার কথা।
সদা ডাকি দুর্গা বলি,
কই এস ত না একবার হেথা;
পাষাণেতে জন্ম লয়ে গেছ মা পাষাণী হয়ে,
তোর দেখে কার্য্য হই আশ্চর্য্য
ভোলানাথে বড় লাগে ব্যথা।
(এই গানটি ১২৭৩ সালে রচিত)

(২)

আমি কি মা তোর নই কো ছেলে ?
নানা তাপে তাপিত করে বিশুদ্ধ ভাব হরে' নিলে।
পুত্র সনে ছলনা কর
পাষাণীর মেয়ে ব'লে,
আমি কেমন পুত্র দেখাব তোমায়
তোমারি ঐ চরণবলে।
অনেক যুদ্ধ করেছ মা
জয়ী হয়েছ সকল স্থলে,
এবার সন্তানের যুদ্ধে হারতে হবে তোর,
নইলে শীঘ্র ভোলানাথকে নেগো কোলে।

(এই গানটি ১২৭৫ সালের রচনা)

(৩)

যেতেও একা আসতেও একা ;
হেথা তোঁর সঙ্গী কত শত শত
বলি সে পথে কার পাবি দেখা।
কেউ সাঙ্গাত কেউ বা মিতে,
কেউ মাতা কেউ বা পিতে ;
ভাই ভগিনী দারা সুতে লাগিয়েছে খুব ধোঁকা ;
আবার সেই কুহকে বদ্ধ হয়ে আমার মন হয়েছে গুটিপোকা।
কর্‌তেছে আমার আমারি,
কে তোমার তুমি বা কার ?

হরিনাম সঙ্গী তোমার ভুলেছ তা বোকা ;
নইলে পথের সম্বল কি করলি বল
সঙ্গে যাবে না তোর পয়সা টাকা ।
কয় দ্বিজ এ ভোলার মন
কণ্ঠরোধ হবে যখন
ভাই ভগিনী এসে তখন কেউ হবে না সখা ,
তখন তোমার আশা ছেড়ে দিয়ে
করবে বিষয় নিয়ে লেখা জোখা ।

(৪)

হে শিব শঙ্কর শশধর ধর,
হের হে হের অপাঙ্গে ।
গুণহীন জনে তার হে স্ব-গুণে
কৃপাদানে কৃপা এ পাপ অঙ্গে ।
আমি গুণহীন অতি অভাজন,
না জানি ভজন না জানি পূজন,
কণ্টকাবৃত কলুষ কানন
ভ্রমণ করি কুসঙ্গে ।
আজ কা'ল ক'রে হ'ল দিন গত,
নিকট হইল দিনমণি সুত,
ভ্রমে ভুলে তব নামে নাহি রত
ভোলানাথ ভ্রূভঙ্গে ।

(৫)

হরি, তুমিও আমাতে আমিও তোমাতে,
তোমাতে আমাতে কোন ভেদ নাই,
তুমি না থাকিলে না থাকিব আমি,
আমি না থাকিলে না থাকিবে তুমি,
তুমি আমি কেবা তাই তোমায় শুধাই।

(এই গানটি গুরুদেবের স্মৃতি হইতে এইরূপ অসম্পূর্ণভাবেই পাওয়া গিয়াছিল। সময়ান্তরে পুনরায় চেষ্টা করিলে হয়ত সম্পূর্ণই পাওয়া যাইত, কিন্তু তাহা আর ঘটিয়া উঠে নাই।)

(৬)

মা চেয়ে ভাল বিমাতা ;
ও মন মায়ের আবার মায়া কোথা ?
মায়ের যেটি ভাল ছেলে
তাকেই তার দয়া মমতা ;
মা যে অকৃতী সন্তানের প্রতি
চায় না ফিরে কয়না কথা।
ভোলার মন, এই বেলা শোন
বলি কেজো কাজের কথা,
ও বিমাতার যে শরণ নিবে
মা আপনি খুঁজে যাবেন সেথা।

(৭)

ও মন, মুদে দেখ আঁখি জগৎ যে কি,
সকলই যে ফাঁকি এ ভব সংসার।
আমি আমার কেবা ভবে আছে যেবা
ছাড় সব কর হরিপদ সার।
ভাই বন্ধু সুত আর পরিবার—
ভেবে দেখ মন কেই বা তোমার,
যবে হবে শবাকার এ দেহ তোমার
ভব পারে তোরে কে করে দিবে পার।
ভোলার মন, ভুলে অনিত্য বৈভবে
মিছে কেন তুমি মর ঘুরে ভবে ?—
ভবারাধ্য ধন ভাব রে ভক্তিভাবে
ভব কারাগারে আসিবি না আর।

(৮)

শিবে, সহেনা সহেনা আর বন্ধন যাতনা,
কোলে তুলে নে মা ওগো ত্রিনয়না,
দে মা মোচন ক'রে
আসি' হৃদি পরে—
নইলে পাপতাপের জোরে আর বাঁচি না।
মা, এসে দ্বীপান্তরে
মায়ার মায়ায় প'ড়ে

ত্রিতাপে তাপিত হ'য়ে মরি ঘুরে,
দে মা পাপ ঘুচায়ে ওগো অভয়ে
পাপী ব'লে আর ছলনা ক'রো না।
ভোলানাথ বলে,
যাস্ না যেন ভু'লে
দুষ্ট ছেলে ব'লে রাখিস সদা কোলে।
ভুলো না ভুলো না ওগো ত্রিনয়না
কোল ছাড়া যেন কখনো ক'রো না।

(এই গানটি ১২৭৭ সালের রচনা)

ক্রমশঃ

মহাজনের বাণী

(সংকলিত)

(১)

অশ্রুই অনন্ত ধ্যানের সহায়। নিবিড় অন্ধকারই গন্তব্য পথের সঙ্গী। গুরুদেবের নামই একমাত্র আশ্রয়। গুরুদেবকে সমস্ত নির্ভর—ইহাই কর্ম। হৃদয়ভেদী ব্যাকুলতাই সাধনা। গুরুদেবের আকর্ষণই স্বাভাবিক যোগ।

—শ্রীশ্রীভৃগুরাম পরমহংস

(২)

চিন্তা কি ? বৃথা চিন্তা করিও না। নির্ভর করিতে শিক্ষা কর। নির্ভর ভিন্ন জীবের গতি নাই।

—শ্রীশ্রীবাবা বিশুদ্ধানন্দ

(৩)

চিত্ত নির্মল কর, ভগবানের কৃপা বা শক্তি অনুভব করিতে পারিবে।

—শ্রীশ্রীবাবা বিশুদ্ধানন্দ

(৪)

নির্ভর আমারে যেবা একাগ্রেতে করে।
সব ভার আমি তার লই শিরোপরে॥
চকিতে চলিতে যদি কাদা লাগে গায়।
আমিই ধুইয়া লয়ে কোলে করি তায়॥

—মাতৃসূক্ত-পরমগীতা

(৫)

কোন বিষয়ে হতাশ না হইয়া সত্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে থাকিতে সত্যই সকল ব্যবস্থা করেন।

—শ্রীশ্রীরামঠাকুর

(৬)

নামে রুচি হউক আর নাই হউক, সুখ হউক আর দুঃখই হউক, অকাতরে দিবানিশি নামের দাস হইয়া থাকিতে হয়। * * * নাম করিতে করিতে ভগবান্ জাগিয়া পড়েন।

—শ্রীশ্রীরামঠাকুর

(৭)

মনের বেগ, বুদ্ধির বেগ এবং বাসনা অর্থাৎ কামনার বেগ সহ্য করিয়া কেবল শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতে হয়। এই লক্ষ্যকেই লক্ষ্যরূপ সমাধি বলে। এই জপ করিতে করিতে হংসের উদয় হয়। ইহাকেই নামের উদয় বলে।

—শ্রীশ্রীরামঠাকুর

(৮)

কেন হবে না? তোমরা নিরাশ হও কেন? কোন্ মুহূর্ত্তে কাহার কি হয় কে জানে? এই ক্ষণ কেন বল না—'এই ধরিলাম,' 'ছাড়িলাম' বলিও না। একটা কিছু ধর—তবেই দেখিবে এই ভাবে বন্ধন ছিঁড়িয়া যাইবে।

—শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

(৯)

সর্বরূপে, সর্বভাবে, তিনিই ত। যখন যা হচ্ছে, তিনিই করান, তিনিই করেন, তিনিই শুনেন। সর্ব বিষয়ে তাঁর উপর কেবল নির্ভর।

—শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

(১০)

তাঁকে ডাকিলে বাজে ভাবনার বিড়ম্বনা দূর হইবে, বুঝিতে পারিবে ত্রিতাপ-হারিণীর দয়া কিরূপ। নির্ভর বিরুদ্ধ ক্রিয়াদির কার্য্যসমূহ যে সাধন পথের বিঘ্ন তাহা স্পষ্টই জানিতে পারিবে। চিন্তা কি ?

—শ্রীশ্রীবাবা বিশুদ্ধানন্দ

(১১)

হৃদয়ে আমার ধ্যান স্বরূপ-চিন্তন।
নিশিদিন মধুময় ভাবে নিমজ্জন॥
এইরূপে মনে প্রাণে করিলে যতন।
আমার ইচ্ছায় হয় বশীভূত মন॥

—শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতা—'কায়াভেদী বাণী'

(১২)

শ্বাস-প্রশ্বাসে লক্ষ্য রেখে নাম করার মত উপকার কিছুতেই নয়। ইহার উপকারিতাই অন্য প্রকার। সহজ শ্বাস-প্রশ্বাসে একবার ঠিক মত নামটি গেঁথে গেলেই আত্মদর্শন হয়।

—শ্রীশ্রীপ্রভু বিজয়কৃষ্ণ

(১৩)

ভগবান্ যখন যা করতে আসেন তা না ক'রে যান না। তিনি যাদের ধরেন কখনও তাদের ছাড়েন না। তিনি না ধরলে মানুষের কি সাধ্য যে তাঁকে ধ'রে থাকে? মানুষের কিছুই ক্ষমতা নেই—তাঁর কৃপাই সার।

—শ্রীশ্রীপ্রভু বিজয়কৃষ্ণ

(১৪)

তোমার নিজকে ছাড়িয়া এক পা অগ্রসর হইলেই তুমি ভগবানের সত্তাতে উপনীত হইয়াছ দেখিতে পাইবে।

—শ্রীআবুসৈয়দ ইবন আবিল খয়ের

(১৫)

প্রভু, তোমার প্রেম-মদিরা দ্বারা আমাকে উন্মত্ত কর। তোমার দাসত্বের শৃঙ্খল আমার চরণে পরাইয়া দাও। আমাকে একমাত্র তোমার প্রেম ব্যতীত আর সব কিছু হইতে মুক্ত করিয়া রিক্ত কর। এই ভাবে আমাকে মৃত্যুর মধ্য দিয়া নিত্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত কর। যে ক্ষুধা তুমি জাগাইয়াছ একমাত্র পূর্ণতাতেই তাহার পরিসমাপ্তি।

—শেখ আবহুল্লা আনসারি

ক্রমশঃ

জ্ঞানগঞ্জের পত্রাবলী

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্

প্রায় ২৪ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীগুরুদেবের অনুমতি অনুসারে ৺কাশীধাম হইতে জ্ঞানগঞ্জের কয়েকখানা পত্র 'ছয়খানি পত্র' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ পত্রগুলি এবং আরও কয়েকখানা পত্র আমার নিকট বহুদিন হইতে সযত্নে রক্ষিত ছিল। ১৯১৮ সালের ২১শে জানুয়ারী তারিখে আমি শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে আশ্রয় লাভ করি। তখন বেনারস হনুমান্ ঘাটের আশ্রমে বাবা থাকিতেন। আমার দীক্ষার কিছু দিন পরে জ্ঞানগঞ্জ সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে একদিন বাবা বলেন যে পশ্চিম হইতে পত্র আসিয়াছে, তাহাতে আমাদের কথা আছে। 'পশ্চিম' বলিতে বাবা জ্ঞানগঞ্জই লক্ষ্য করিতেন, ইহা আমরা জানিতাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা, ঐ পত্রখানা কি আমরা দেখিতে পারি না ?" বাবা বলিলেন, "উহাতে তোমাদের সম্বন্ধেও আলোচনা আছে। তাই উহা এখনও তোমাদিগকে দেখাইতে পারি না।" আমি বলিলাম, "আমি আমাদের ব্যক্তিগত সমালোচনা দেখিবার জন্য উৎসুক নহি। আমার ঔৎসুক্য শুধু এই দেখিবার জন্য—তাঁহারা কি প্রকার লেখেন—তাঁহাদের ভাষা কি প্রকার—ভাব-প্রকাশের পদ্ধতি কিরূপ, এই সব বিষয়।" বাবা বলিলেন, "পুরাতন পত্র অনেক আছে—বর্দ্ধমানে আছে, তোমাকে পরে দেখাইব।"

ইহার কিছুদিন পরে বাবা বৰ্দ্ধমান যান। পর বৎসর কাশীতে আসিবার সময় যদৃচ্ছা-সংগৃহীত কয়েকখানা পত্র লইয়া আসেন ও আমাকে দেন। ইহার পরে আরও কয়েকখানা পত্র দেন। আমি পত্রগুলি পাইয়া খুব যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম। এইগুলি সবই আমার দীক্ষার পূর্ব্বকালীন পত্র। দীক্ষার পরবর্ত্তী সময়ের কোন পত্র আমাকে দেন নাই ও দেখান নাই। তবে বহু বৎসর পর, বোধ হয় ১৯২৬ সালে, গোমোতে অথবা ধানবাদে অবস্থান কালে উমানন্দ স্বামীর একখানা পত্র পাইয়াছিলেন—উহা আমাকে দেখিতে দিয়াছিলেন। উহা বিজ্ঞান-মন্দির স্থাপনের পরের কথা। তাঁহার অনুমতিক্রমে ঐ পত্র আমি নকল করিয়া লইয়াছিলাম। পূর্ব্বের পত্রগুলির মূল কাপী আমার নিকট ছিল।

পত্রগুলি কিভাবে আসিত তাহা বলা যায় না। কোন কোন পত্রে জ্ঞানগঞ্জের মোহর আছে—তাহাতে নাগরী অক্ষরে লেখা আছে "পাঞ্জাব আশ্রম—স্বামীজী"। একখানা খামে টীকেটের উপর মোহরে ছাপা ইংরেজী অক্ষরে আছে—'Jnanananda Swami Asram--Punjab'. একখানাতে ছিল "Golden Temple Amritsar." কোন কোন খামে ইংরেজী অক্ষরে জলন্ধরের (Jullundhar City) মোহরও দেখিয়াছি। এইগুলি ঠিক ডাকে আসিতে দেখি নাই। যেমন লেন্স, বিজ্ঞানের বড় বড় যন্ত্র, বড় বড় ঔষধের শিশি শূন্যমার্গে আসিত ও এখান হইতে জ্ঞানগঞ্জের কুমারীদের জন্য বস্ত্রাদি শূন্যমার্গে যাইত, বোধ হয় এই সকল চিঠিও অধিকাংশ

স্থলে সেইভাবে আসিত। বাবা এ সব রহস্য সাধারণ লোকের নিকট স্পষ্ট করিয়া খুলিতেন না। তবে অলৌকিক উপায়ে যে অনেক জিনিষ আসিয়াছে ও তিনিও পাঠাইয়াছেন তাহা আমার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট।

আমার পূর্ব্বোক্ত সংগ্রহ হইতেই 'ছয়খানা পত্র' নির্ব্বাচন করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছিল। ঐ পুস্তিকাখানি কলিকাতাতে মুদ্রিত হইয়াছিল। সম্পাদনের ত্রুটিতে উহাতে অনেক অশুদ্ধি বর্ত্তমান ছিল। সম্প্রতি ঐ চিঠিগুলি এবং আরও কয়েকখানা অপ্রকাশিত চিঠি 'জ্ঞানগঞ্জের পত্রাবলী' নামে ক্রমশঃ বিশুদ্ধবাণীতে প্রকাশিত করার সঙ্কল্প করা হইয়াছে। চিঠিগুলি যথাবৎ মুদ্রিত হইবে। কোন স্থানে কোন ব্যক্তির নাম থাকিলে উহার উল্লেখ থাকিবে না। যদিও উল্লিখিত বহু ব্যক্তি এখন পরলোকগত, তথাপি ব্যবহারগত শিষ্টতার অনুরোধে কোথাও কাহারও নাম-নির্দ্দেশ থাকিবে না। ইতি—

প্রথম পত্র

নমো নারায়ণায়

কৃষ্ণপক্ষ

১৮২৭।১০।৬

নারায়ণস্মরণবর

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

অভয়ানন্দ স্বামীর শুভ সংবাদে যথাবিধানে সম্ভাষণপূর্ব্বক বিজ্ঞাপন পরম্—

তোমার প্রেরিত শুভ সংবাদে পরমানন্দ লাভ করিলাম।

শ্রীশ্রীবিশ্বনাথের সমীপে প্রার্থনা করি তোমার অভিলাষ সুসিদ্ধ হউক, এই আমার ইষ্ট। (পরমারাধ্য) গুরুদেব কয়েক দিবস হইল এখানে নাই, তিনি মনোহর তীর্থে গিয়াছেন। আমিও তাঁহার নিকট শীঘ্রই যাইব। এখন দুই তিন দিন হরিদ্বারে থাকিলাম।

মানবীয় ভাব অতীত হইয়া আবার এ কি ? চৈতন্য স্বরূপের উচ্ছ্বাস ভাব মন, স্থূল তত্ত্বের পরিমিত শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া দম্ভ দ্বেষাদির উত্তেজনায় সময়ে সময়ে বিপদ উপস্থিত করে এবং পৃথিবী শোণিত-সিক্ত করিয়া আত্মম্ভরিতা দোষে আক্রান্ত করে। দুর্দ্দমনীয় রিপুগণের প্রবল শাসনে সাধু চিন্তা, ধর্ম্মানুরাগ, ব্রহ্মভাবে নিষ্ঠা, সদসৎ ইচ্ছা কিছুই থাকে না। তথাপি এমন অবস্থাতেও অচেতন জড়শক্তি চেতনশক্তিসম্পন্ন চিত্তকে বদ্ধ রাখিতে সক্ষম নহে। কারণ বিধাতার অমোঘ দণ্ড প্রতিমুহূর্ত্ত কাল পাপপ্রবৃত্তি প্রতি বর্ষিত হইতেছে। রেখামাত্র পবিত্রতার সংস্পর্শে দেবশক্তির প্রভা প্রদীপ্ত হইয়া মেঘনির্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় চিত্তকে দেবভাবে অনুরঞ্জিত করে। উহা কামাদির নির্যাতন বা তাহাদের পাপ প্রলোভনে প্রতারিত হয় না, দেবতত্ত্বের অন্বেষণে নিয়তকাল ব্যাকুল থাকে, ব্রহ্মকৃপা স্বাভাবিক আসিয়া পড়ে। ক্রমে ক্রমে বিশুদ্ধ স্বর্গীয় ভাব মর্ম্মভেদ করিলে দয়া দাক্ষিণ্য ক্ষমা ধর্ম ঔদাস্য সারল্য এই ছয়টি মহাবৃত্তির প্রভাবে মানবীয় ভাব ও ক্রোধাদির বল ক্ষয় হইয়া দেবভাবের আশ্রয় লইতে শক্তি জন্মে। ক্ষুদ্র কীট হইতে উচ্চাধম পর্য্যন্ত কোন বিশেষত্ব থাকে না। সকলের ভিতরে একমাত্র নিরাকার অখণ্ড

শক্তিরও প্রকাশ প্রত্যক্ষ হয়। তখন জ্ঞান অজ্ঞান মানব বা কীট এই সমূহ ভেদ ভাবনা থাকে না।

তাতেই বলি গুহা সম্বন্ধে উপস্থিত ইচ্ছুকের ইচ্ছা পূরণ করাই তোমার উদ্দেশ্য।

ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীগুরু-স্মৃতি

শ্রীগৌরীচরণ রায়

সন ১৩২৫ সালে (ইং ১৯১৮ খৃঃ) ৩৬ ছত্রিশ বৎসর বয়সে আমাদের দীক্ষা হয়। এত অধিক বয়স পর্য্যন্ত দীক্ষা না হওয়ার কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে একটুকু পূর্ব্ব কথা প্রকাশ করিতে হয়। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব ও ৺খুড়ামহাশয়ের দীক্ষার কিছুকাল পরেই আমাদের কুলগুরু অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন। তাঁহার বিধবা পত্নী ভিন্ন গুরুকুলে আর কেহ জীবিত ছিল না। তিনি আমাদের সকলকে দীক্ষা দিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তিনি পতি-পুত্র-বিহীনা বলিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা লওয়া অবৈধ বোধে বংশের কাহারও দীক্ষা লওয়া হইল না। গুরুপত্নীর অভিশাপের ভয়ে আর অন্য গুরু অন্বেষণের চেষ্টা করাও হইল না।

কালে গুরুপত্নী ঠাকুরাণী পরলোক গমন করিলেন। তখন আমাদের বংশে আমা অপেক্ষাও বয়োজ্যেষ্ঠ অনেকে অদীক্ষিত ছিলেন। সুতরাং এবার গুরু অন্বেষণ চলিতে লাগিল। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীপাট কেন্দুলা গ্রামে ৺মহিষমর্দ্দিনী দেবী আছেন। এইজন্য ইহা "মহিষমর্দ্দিনী পাট" বলিয়া দেশ-বিখ্যাত। আমরা এবং আমাদের দেশস্থ বহু ব্রাহ্মণ বংশ এই পাটের শিষ্য। ৺দক্ষিণাপ্রসাদ রায়চৌধুরী দাদামহাশয়দের কুলগুরু কুমারডি নিবাসী গোস্বামী মহাশয়গণ এবং আমাদের

গুরুভ্রাতা ৺পূর্ণানন্দ গোস্বামী প্রভৃতি সরপী নিবাসী গোস্বামী মহাশয়গণ উক্ত মহিষমর্দ্দিনী পাটের গোস্বামীদের দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি বলিয়া পরিচিত। আমার জন্মস্থান নুনীগ্রামে ইঁহাদের অনেক ঘর ব্রাহ্মণ শিষ্য আছে। আমাদের বংশের অনেকে আর বিলম্ব না করিয়া সরপীর গোস্বামী বংশের একজনের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। আমি কিন্তু তাঁহাদের মতাবলম্বী হইতে পারিলাম না। আমার মনে হইল, আমাদের পিতৃগুরুবংশ নাই, সুতরাং কুলগুরু ত্যাগের কোন প্রশ্ন নাই ; কেবল শ্রীপাটের মোহে পড়িয়া ব্যবসায়ী গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ করা কর্ত্তব্য নহে ; কোন বন্ধন না রাখিয়া যথাসাধ্য গুরু অন্বেষণ করিব ; যদি সদ্‌গুরু লাভ হয়, তাঁহার শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণ করিব ; যতদিন সদ্‌গুরু না পাই ব্রাহ্মণোচিত ত্রিসন্ধ্যা, গায়ত্রী জপ, পূজাপাঠাদি করিয়াই জীবন অতিবাহিত করিব। এই সঙ্কল্পই কার্য্যে পরিণত হইল।

সময় না হইলে সদ্‌গুরু লাভ হয় না। শ্রীশ্রীবাবার ও আমার জন্মস্থান বর্দ্ধমান জেলায়, মাত্র ৩০।৩৫ ক্রোশের ব্যবধান ; বাবার কর্ম্মস্থল গুষ্করা আরও নিকট। গুষ্করার পর বাবা বর্দ্ধমানে থাকিতেন। বর্দ্ধমান আমাদের সদর, মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি নানা কার্য্যে বর্দ্ধমান গিয়াছি, হয়ত বা বাবার পাশ দিয়াই চলিয়া গিয়াছি ; কিন্তু দর্শনলাভ দূরে থাকুক তাঁহার নাম পর্য্যন্ত কাণে শুনি নাই। আসানসোল আমার বাড়ী বলিলেই হয়। সেখানে থানায়, রেলে, কোর্টে বাবার কত শিষ্য রহিয়াছে, কিন্তু কাহারও মুখে বাবার নাম পর্য্যন্ত শুনি নাই। আমি, 'হা গুরু! কোথায়

গুরু !' বলিয়া কাঁদিয়াছি ; গুরুদেবও নিকটেই রহিয়াছেন, কিন্তু সময় পূর্ণ না হওয়ায় তাঁহার দর্শনলাভ হয় নাই। কিন্তু যখন সময় পূর্ণ হইল তখন আর কোন বিধি-ব্যবস্থারই প্রয়োজন হইল না। বাবার নিকট গিয়া দীক্ষা প্রার্থনা করিলাম না,—যাওয়া দূরে থাকুক নিজের হাতে একখানা পত্র লিখিয়াও কৃপা ভিক্ষা করিলাম না। তাহা হইলে কি হইবে ? তখন যে তাঁহার চিহ্নিত দাসকে শ্রীচরণে স্থান দিবার সময় আসিয়াছে, তাই দয়াময় ডাকিয়া বলিলেন—"আইস, দীক্ষা গ্রহণ কর।" কথাটা একটু স্পষ্ট করিয়া বলি।

ইং ১৯১৭ সালের কথা। তখন আমার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান্ হরিশ্চন্দ্র রায় খাস্থড়ি ষ্টেশনের (B. N. Ry.) নিকট নদ্‌খুরকী কলিয়ারীর ম্যানেজার। সেই সময় তাহার এক প্রকার ব্যাধি হইল ;—তাহার মনে হইত যেন তাহার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া আসিতেছে, এখনই মৃত্যু হইবে। সেই সময় সে ভয়ে নিজের বাটীর সকলকে নিজের কাছে একত্র করিত। কলিয়ারীর ডাক্তার কোন প্রতিকার করিতে না পারিয়া, বিশ্রাম লইবার জন্য কিছুদিন ছুটীর ব্যবস্থা করিলেন। বাটী আসিয়াও সেই প্রকার ভাব চলিতে লাগিল। আমি ব্যাধি নির্ণয়ের জন্য তাহাকে কলিকাতা পাঠাইলাম। সেখানে ভাল ভাল ডাক্তার দিয়া পরীক্ষা করান হইল, কিন্তু কেহই হৃদ্‌যন্ত্রের কোন দোষ পাইলেন না। তাঁহারা একবাক্যে বলিলেন—"ইহার কোন ব্যাধিই নাই। ইহা মনের রোগ।" বাটী ফিরিয়া আসিলে কবিরাজী চিকিৎসা করান হইতে লাগিল। তাঁহারা বলিলেন—"ইহা এক প্রকার

বায়ুরোগ"। তদ্রূপই চিকিৎসা চলিল, কিন্তু বিশেষ ফল কিছুই হইল না। ছুটী শেষ হইলে সে আবার কলিয়ারীতে গিয়া কর্ম্মে যোগদান করিল।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী* নদখুরকী কলিয়ারীর ক্যাসিয়ার। তিনি একদিন হরিশকে বলিলেন, "আমার গুরু শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব ধানবাদে তথাকার ষ্টেশন মাষ্টার শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় আসিয়াছেন। চলুন, একদিন গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসি। আমার বিশ্বাস, তাঁহার কৃপায় আপনার এই ব্যাধি আরোগ্য হইয়া যাইবে।" তদনুসারে তাঁহারা দুইজনে ধানবাদে গিয়া বাবাকে প্রণাম করিয়া আসিলেন। তাঁহার দৃষ্টিমাত্রে হরিশের রোগ আরোগ্য হইয়া গেল। বাবা বলিলেন, "দীক্ষা হইয়া গেলে এ ব্যাধির পুনরাক্রমণের কোন ভয়ই থাকিবে না।" বলা বাহুল্য, তাহার দীক্ষার অনুমতি হইয়া গেল। হরিশ ধানবাদ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইল। আমি গিয়া দেখিলাম, তাহার শরীরের পূর্ব্ব লাবণ্য ফিরিয়া আসিয়াছে, যেন আর কোন ব্যাধিই নাই। সে আমার নিকট ধানবাদ যাওয়ার সমস্ত বিবরণ আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল।

---

*শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী আমাদের গুরুভ্রাতা, আমাদের আগেই তাঁহার দীক্ষা হইয়াছিল। হরিশ নদখুরকী হইতে চলিয়া আসার পর ইনিও সেখানকার চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া কুমারডুবী পটারী ওয়ার্কসের ষ্টোর কিপারের পদ গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি বাবার একখানা ফটো এনলার্জ্জ করাইয়া, সেই বড়-ফটো অনুরূপ একটি ব্লক প্রস্তুত করান। এই ব্লকের বাবার প্রতিমূর্ত্তি এখনও অনেকের নিকট আছে।

হরিশ আমাকে বলিল, "দাদা, আমি বাবার নিকট দীক্ষার অনুমতি পাইয়াছি। এখন আপনি অনুমতি দিলেই আমি দীক্ষার জন্য প্রস্তুত হই।"

হরিশের মুখে বাবার নাম ও যোগশক্তির কথা শুনিয়া আমার দেহে যেন একটা আনন্দপ্রবাহ ছুটিয়া গেল। কে যেন আমার ভিতর হইতে বলিতে লাগিল, "তুমি এতদিন যাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া আছ, যাঁহাকে পাইবার জন্য বহুবার আকুল প্রার্থনা জানাইয়াছ, ইনিই তোমার সেই গুরু।" আমি হরিশকে বলিলাম, "ভাই, তুমি আমার দীক্ষার কথাও বাবাকে পত্রের দ্বারা জানাও। তিনি অনুমতি করিলে আমি তাঁহার শ্রীচরণ প্রান্তে উপস্থিত হইয়া আমার প্রার্থনা জানাইব।" কিন্তু কিছুই করিতে হইল না। তিনি যে অন্তর্য্যামী, তিনি যে সর্ব্বদা আমার অন্তরের আকুল প্রার্থনা শুনিতেছেন। আমি দৃষ্টিশক্তিহীন, তাই গুরু অন্বেষণ করিয়া ছুটাছুটি করিতেছি; কিন্তু তিনি যে তাঁহার জন্ম-জন্মান্তরের শিষ্যের উপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেছেন, দুর্ব্বল সন্তানকে কোলে লইবার জন্য বাহু প্রসারণ করিয়া সময়ের অপেক্ষা করিতেছেন। এখন সময় পূর্ণ হইল, এখন আর কোন বিধি-ব্যবস্থা নাই। বাবার নিকট গিয়া দীক্ষা প্রার্থনা করিতে হইল না, "সেখানকার" (জ্ঞানগঞ্জের) অনুমতির (বাহ্যভাবে) প্রশ্ন উঠিল না। ৩।৪ দিন মধ্যে হরিশের পত্রের উত্তর আসিল, "তোমাদের উভয় ভ্রাতার এক সঙ্গে সস্ত্রীক দীক্ষা হইবে।" সকল চিন্তা ও সকল সন্দেহের নিবৃত্তি হইয়া গেল।

দীক্ষার অনুমতি ত হইয়া গেল। কোথায় দীক্ষা হইবে

এই চিন্তা করিয়া মনে একটা খট্‌কা উঠিতে লাগিল। নুনীগ্রামের উত্তর প্রান্তে "শ্রীশ্রী৺কপিলেশ্বর" নামে এক অনাদিলিঙ্গ শিব আছেন। আমাদের কুল-প্রথামত উক্ত শিবালয়ে সকলেরই চূড়াকরণ ও দীক্ষা হইয়া আসিতেছে। অদ্যাপি এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। আমাদেরও চূড়াকরণ উক্ত শিবক্ষেত্রেই হইয়াছে। কিন্তু বাবা কি আমাদের দীক্ষার জন্য নুনীগ্রামে যাইবেন? তাহার ত কোন আশাই নাই। অথচ অন্য স্থানে দীক্ষা হইলে কুলপ্রথা লঙ্ঘন জন্য একটা মানসিক অশান্তি চিরদিনের জন্য থাকিয়া যাইবে। আমার মনোব্যথা সর্ব্বজ্ঞ বাবার নিকট পঁহুছিল, তিনি তাহারও সুব্যবস্থা করিলেন। হরিশ বাবাকে লিখিয়াছিল, কোথায় এবং কোন্ সময়ে দীক্ষা হইবে জানাইলে সেইরূপ ছুটী লইয়া প্রস্তুত হইতে পারিবে। বাবা তাহাকে পত্রোত্তরে জানাইলেন—"শ্যামাপূজার পর যে কোন শুভদিনে ৺কাশীতে তোমাদের দীক্ষা হইবে।" পত্র পাইয়া দীক্ষার স্থানের সংশয় কাটিয়া গেল। ৺কাশী শিবক্ষেত্র, সেখানে দীক্ষা হইলে শ্রীশ্রী৺কপিলেশ্বর শিবের ক্ষেত্রে দীক্ষা না হওয়ার আর কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। অক্টোবর মাসের শেষে হরিশ নদ্‌খুরকীর চাকরী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চাকরী গ্রহণ করিল। সেখানে ডিসেম্বর মাসে যোগ দিবার কথা কহিয়া নভেম্বর মাস অবকাশ গ্রহণ করিল। বাটী আসিয়া ৺কাশী যাইবার আয়োজন হইতে লাগিল এবং শীঘ্র কাশী যাইতেছি বলিয়া বাবাকে পত্র দেওয়া হইল।

আবার নূতন বিঘ্ন উপস্থিত। যাত্রার সমস্ত আয়োজন হইয়া

হরিশ আমাকে বলিল, "দাদা, আমি বাবার নিকট দীক্ষার অনুমতি পাইয়াছি। এখন আপনি অনুমতি দিলেই আমি দীক্ষার জন্য প্রস্তুত হই।"

হরিশের মুখে বাবার নাম ও যোগশক্তির কথা শুনিয়া আমার দেহে যেন একটা আনন্দপ্রবাহ ছুটিয়া গেল। কে যেন আমার ভিতর হইতে বলিতে লাগিল, "তুমি এতদিন যাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া আছ, যাঁহাকে পাইবার জন্য বহুবার আকুল প্রার্থনা জানাইয়াছ, ইনিই তোমার সেই গুরু।" আমি হরিশকে বলিলাম, "ভাই, তুমি আমার দীক্ষার কথাও বাবাকে পত্রের দ্বারা জানাও। তিনি অনুমতি করিলে আমি তাঁহার শ্রীচরণ প্রান্তে উপস্থিত হইয়া আমার প্রার্থনা জানাইব।" কিন্তু কিছুই করিতে হইল না। তিনি যে অন্তর্য্যামী, তিনি যে সর্ব্বদা আমার অন্তরের আকুল প্রার্থনা শুনিতেছেন। আমি দৃষ্টিশক্তিহীন, তাই গুরু অন্বেষণ করিয়া ছুটাছুটি করিতেছি; কিন্তু তিনি যে তাঁহার জন্ম-জন্মান্তরের শিষ্যের উপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেছেন, দুর্ব্বল সন্তানকে কোলে লইবার জন্য বাহু প্রসারণ করিয়া সময়ের অপেক্ষা করিতেছেন। এখন সময় পূর্ণ হইল, এখন আর কোন বিধি-ব্যবস্থা নাই। বাবার নিকট গিয়া দীক্ষা প্রার্থনা করিতে হইল না, "সেখানকার" (জ্ঞানগঞ্জের) অনুমতির (বাহ্যভাবে) প্রশ্ন উঠিল না। ৩/৪ দিন মধ্যে হরিশের পত্রের উত্তর আসিল, "তোমাদের উভয় ভ্রাতার এক সঙ্গে সস্ত্রীক দীক্ষা হইবে।" সকল চিন্তা ও সকল সন্দেহের নিবৃত্তি হইয়া গেল।

দীক্ষার অনুমতি ত হইয়া গেল। কোথায় দীক্ষা হইবে

এই চিন্তা করিয়া মনে একটা খট্‌কা উঠিতে লাগিল। ন্নুনীগ্রামের উত্তর প্রান্তে "শ্রীশ্রী৺কপিলেশ্বর" নামে এক অনাদিলিঙ্গ শিব আছেন। আমাদের কুল-প্রথামত উক্ত শিবালয়ে সকলেরই চূড়াকরণ ও দীক্ষা হইয়া আসিতেছে। অদ্যাপি এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। আমাদেরও চূড়াকরণ উক্ত শিবক্ষেত্রেই হইয়াছে। কিন্তু বাবা কি আমাদের দীক্ষার জন্য ন্নুনীগ্রামে যাইবেন? তাহার ত কোন আশাই নাই। অথচ অন্য স্থানে দীক্ষা হইলে কুলপ্রথা লঙ্ঘন জন্য একটা মানসিক অশান্তি চিরদিনের জন্য থাকিয়া যাইবে। আমার মনোব্যথা সর্ব্বজ্ঞ বাবার নিকট পঁহুছিল, তিনি তাহারও সুব্যবস্থা করিলেন। হরিশ বাবাকে লিখিয়াছিল, কোথায় এবং কোন্ সময়ে দীক্ষা হইবে জানাইলে সেইরূপ ছুটী লইয়া প্রস্তুত হইতে পারিবে। বাবা তাহাকে পত্রোত্তরে জানাইলেন—"শ্যামাপূজার পর যে কোন শুভদিনে ৺কাশীতে তোমাদের দীক্ষা হইবে।" পত্র পাইয়া দীক্ষার স্থানের সংশয় কাটিয়া গেল। ৺কাশী শিবক্ষেত্র, সেখানে দীক্ষা হইলে শ্রীশ্রী৺কপিলেশ্বর শিবের ক্ষেত্রে দীক্ষা না হওয়ার আর কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। অক্টোবর মাসের শেষে হরিশ নদ্‌খুরকীর চাকরী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চাকরী গ্রহণ করিল। সেখানে ডিসেম্বর মাসে যোগ দিবার কথা কহিয়া নভেম্বর মাস অবকাশ গ্রহণ করিল। বাটী আসিয়া ৺কাশী যাইবার আয়োজন হইতে লাগিল এবং শীঘ্র কাশী যাইতেছি বলিয়া বাবাকে পত্র দেওয়া হইল।

আবার নূতন বিঘ্ন উপস্থিত। যাত্রার সমস্ত আয়োজন হইয়া

গিয়াছে। আমরা সস্ত্রীক দুই ভ্রাতা, ৪।৫ টি ছেলে মেয়ে এবং আরও তিনজন আত্মীয়-আত্মীয়া মোট ১১।১২ জন লোক যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি, এমন সময় বাবার একখানা পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন—"কাশীতে একপ্রকার সংক্রামক মারাত্মক জ্বর আসিয়াছে, তাহাতে প্রত্যহ ৪০০।৫০০ শত লোক মরিতেছে। এ অবস্থায় তোমাদের কাশী আসা হইবে না। আমি ইহার পর দীক্ষার সময় ও স্থান নির্দ্দেশ করিয়া পত্র দিব।" পত্র পড়িয়া সকলে বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া গেল। আমার আঘাত অত্যন্ত গুরুতর হইল। দীক্ষার জন্য আমার মন তখন খুব উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, কবে কাশী যাইব কবে দীক্ষা হইবে, এইজন্য দিন গুণিতেছিলাম। দ্বিতীয়তঃ 'শিবক্ষেত্রের' প্রশ্ন। এ যাত্রায় যদি কাশীতে দীক্ষা না হয় তাহা হইলে আর "শিবক্ষেত্রে" দীক্ষার কোন আশাই থাকিবে না। এ আশঙ্কা বড় কম নহে। হরিশের চিন্তা অন্যরূপ। সে বিনা বেতনে একমাস ছুটী গ্রহণ করিয়াছে। এই ছুটী বৃথা হইয়া যাইবে। তারপর নূতন কর্ম্মে যোগদান করিয়া শীঘ্র ছুটী লওয়ারও অসুবিধা হইবে। শেষে যুক্তি স্থির করিলাম, "আমি অদ্যই একলা কাশী গিয়া বাবাকে সমস্ত জানাইয়া যে কোন রূপে হউক তাঁহাকে রাজী করিব। পরে তোমাদিগকে টেলিগ্রাম দ্বারা বাবার অনুমতি জানাইলে তোমরা কাশী যাইবে।" তাহাই হইল। আমি সেইদিনই কাশী রওনা হইলাম।

তখন কাশীর মালদহিয়া আশ্রম নির্ম্মিত হয় নাই। বাবা হনুমান ঘাটের নিকট দলীপগঞ্জ মহল্লায় (বর্ত্তমান আউদগর্বী)

২৮০ নং "বিশুদ্ধানন্দ কুটীর" নামক আশ্রমে থাকিতেন। আমি সকাল ৯টার সময় উক্ত আশ্রমের ত্রিতলে গিয়া বাবার চরণ বন্দনা করিলাম। এই আমার প্রথম গুরুদর্শন। আমি প্রণাম করিয়া জোড়হাতে অভিভূতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। বাবা "কিগো, ভাল ত সব" বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন এবং বসিতে বলিলেন। আমার বিহ্বলভাব কাটিয়া গেলে বাবাকে সব কথা বলিলাম। এখন দীক্ষা না হইলে যে নানাদিকে অসুবিধা হইবে তাহা সরলভাবে নিবেদন করিয়া বাবার নিষেধ আজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য করজোড়ে প্রার্থনা করিলাম। বাবা সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন—"আমি যখন অনুমতি দিয়াছি তখন দীক্ষা দেওয়ায় আমার কোন আপত্তি নাই। এখানকার এই ব্যারাম আদির জন্য এখন আসিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। তোমরা যখন এতদূর অগ্রসর হইয়াছ তখন আর বিলম্ব করিয়া কাজ নাই; হরিশকে আসার জন্য টেলিগ্রাম করিয়া দাও। তবে এখন এখানে বেশী দিন থাকা হইবে না, দীক্ষার পরেই বাড়ী ফিরিয়া যাইবে।" আমি তাঁহার আদেশমত হরিশকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়া দিলাম। সে যথাসময়ে কাশী আসিয়া উপস্থিত হইল। সন ১৩২৫ সাল (ইং ১৯১৮ খৃঃ) শুভ ১লা অগ্রহায়ণ রাস পূর্ণিমার দিন আমাদের সস্ত্রীক দীক্ষা হইয়া গেল। আমরা বাবার শ্রীচরণে আশ্রয় লাভ করিয়া চরিতার্থ হইলাম।

বাড়ী ফিরিয়া হরিশ যথাসময়ে কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেল। আর কখনও তাহার সেই রোগ দেখা যায় নাই। আমাকে একবার বর্দ্ধমান যাইতে হইল। দীক্ষার পর বাড়ীতে পূজার ঘরে রাখার

জন্য বাবার দুইখানি ফটো বাবার কাছে চাহিয়াছিলাম। বাবা বলিয়াছিলেন, "আমার এখানে উপস্থিত কোন ফটো নাই, তুমি বর্দ্ধমানে বীরেনের নিকট হইতে ফটো পাইতে পার।" তাঁহার নির্দ্দেশমত বর্দ্ধমানে গিয়া বাবার দুইখানা ফটো লইয়া আসিলাম। এইবারেই বীরেন দাদার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হইল। ইতিপূর্ব্বে কাশীতে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মণীন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল। তিনি আমাদের দীক্ষার সময় দ্রব্যাদি ক্রয় করা প্রভৃতিতে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান হইতে ফিরার মাসাধিক কাল পরে, পৌষ মাসের শেষে, বণ্ডুল হইতে বীরেন দাদার লিখিত একটি দুঃসংবাদপূর্ণ পত্র পাইলাম। তাহাতে লিখিত ছিল— "বিগত ২২শে পৌষ বাবার মাতৃদেবী পরলোক গমন করিয়াছেন। বাবা তখন কলিকাতায় ছিলেন, তিনি বণ্ডুল আসার পর কয়েকদিনের মধ্যে ইন্দ্রকাকা, বিষ্ণুদাদা ও মটরদিদির পরলোক প্রাপ্তি হয়।" পত্র পাঠ করিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলাম। পত্র লেখার ভঙ্গীতে বুঝিলাম বীরেন দাদা খুব ভয় পাইয়াছেন। আমি তৎক্ষণাৎ বণ্ডুল যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম, এবং যথাসময়ে বর্দ্ধমান আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে হরগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় দাদামহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন, "তোমার এখন বণ্ডুল যাওয়া হইবে না, বাবা বিশেষভাবে আদেশ দিয়াছেন, যেন কোন শিষ্য এখন বণ্ডুল না যায়।" অগত্যা ক্ষুণ্নমনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। বাবা শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমাধা করিয়া দুর্গাদাদা, শিবুদাদা প্রভৃতি সকলকে সঙ্গে লইয়া বর্দ্ধমান আসিলেন।

বণ্ডুলে "ভোলানাথেশ্বর হরহরি-বাণলিঙ্গ" প্রতিষ্ঠা হইবার পর হইতে প্রতি বৎসর "শিবরাত্রি" উপলক্ষে সেথায় বিরাট্ উৎসব হইত। বহু শিষ্য বণ্ডুল গিয়া এই উৎসবে যোগদান করিতেন। শুনিয়াছি এই উপলক্ষে স্থানীয় ৩০০০।৪০০০ হাজার লোককে ভূরিভোজন করান হইত। ২।৩ দিন ধরিয়া "দীয়তাং ভুজ্যতাং" চলিত। পল্লীগ্রামে এতলোকের খাওয়ানের আয়োজনের সুব্যবস্থা বড় সহজ ব্যাপার নহে। পূজনীয় ইন্দ্রকাকা এই ব্যাপারের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন! তিনি উৎসবের একমাস পূর্ব্ব হইতে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া ভাণ্ডার জাত করিতেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে এই বিরাট্ ব্যাপার শেষ পর্য্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত। এ বৎসর তাঁহার অভাবে বণ্ডুলে ৺শিবরাত্রি উৎসব করা অসম্ভব হইল। তাই বাবা আদেশ প্রচার করিলেন, "এবার বর্দ্ধমানে ৺শিবরাত্রি উৎসব হইবে।" তাহাই হইল, কিন্তু শুধু এবার নহে, ইহার পরও কয়েক বৎসর এখানেই ৺শিবরাত্রি উৎসব হইল। পরে কাশীর বিশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রমে শিব-প্রতিষ্ঠা হইলে সেখানেই ৺শিবরাত্রি উৎসব হইতে লাগিল। আর কোন দিনই বণ্ডুল আশ্রমে ৺শিবরাত্রি উৎসব হইল না। সুতরাং আমার ভাগ্যে বণ্ডুল আশ্রমের ৺শিবরাত্রি দর্শন আর ঘটিয়া উঠিল না। যাহা হউক, যথাসময়ে বর্দ্ধমান আশ্রমে গিয়া ৺শিবরাত্রি ব্রত পালন করিলাম। বাবা এই সময়ে সন ১৩২৬ সাল ২রা বৈশাখ ৺পুরীর আশ্রম প্রতিষ্ঠার কথা জানাইয়া দিলেন এবং সম্ভব হইলে ঐ সময় ৺পুরী যাইতে বলিলেন।

আমি ইহার পূর্ব্বে কোন দিন পুরী যাই নাই। সুতরাং বাড়ী

ফিরিয়া পুরী যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম এবং চৈত্র মাসের শেষে পুরী যাত্রা করিলাম। গিয়া দেখিলাম আর্মষ্ট্রং রোডের উপর বাড়ীটি চুনকাম ও মেরামত হইতেছে। কলিকাতা হইতে কেহ আসে নাই। আমি গিয়া পাণ্ডার বাড়ীতে উঠিলাম, এবং শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দর্শন, সমুদ্র স্নান প্রভৃতি তীর্থ কার্য্য করিতে লাগিলাম। এইটি পুরীবাসের শ্রেষ্ঠ সময়; পাণ্ডার নিযুক্ত লোক সঙ্গে লইয়া নানা স্থানে দর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। সন ১৩২৬ সাল শুভ ১লা বৈশাখ রাত্রির ট্রেনে বাবা আসিয়া পঁহুচিলে ২রা বৈশাখ সকালে আশ্রমে গিয়া সকলের সঙ্গে মিলিত হইলাম। ঐ তারিখে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় দাদা বাবাকে ঐ বাড়ীটি আশ্রমের জন্য দান করিলেন। আশ্রমটি "বিশুদ্ধানন্দ ধাম" নামে প্রতিষ্ঠিত হইল। আমি ইহার পর কয়েক দিন থাকিয়া বাড়ী ফিরিলাম। বাবা এইবার পুরী গিয়া মাঘ মাস পর্য্যন্ত সেখানে ছিলেন। আমি পৌষ মাসের মাঝামাঝি দ্বিতীয় বার পুরী গিয়াছিলাম। বাবা তাঁহার ৺মাতাঠাকুরাণীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধের জন্য বণ্ডুল হইতে তাঁহার কুল-পুরোহিতকে আনাইয়া ছিলেন। শ্রাদ্ধের দিন বাবা আমাকে শ্রাদ্ধের জন্য অন্ন-পাক করিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন। ঐদিন অন্নপাক হইতে সমুদ্র জলে পিণ্ড বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত যাবতীয় কার্য্যে বাবার সহায়তা করিবার অধিকার পাইয়া নিজকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়াছিলাম। ৺ঠাকুরমার আদ্যশ্রাদ্ধের সময় বর্দ্ধমান হইতে ফিরিয়া আমার যে দুঃখ হইয়াছিল, তাহা এবারকার আনন্দস্রোতে কোথায় ভাসিয়া গেল। ইহার পর আরও কয়েকদিন থাকিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

আমাদের কুলগুরুগণ বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার শিষ্যগৃহে আসিতেন। শিষ্য সকলে গুরুদর্শন ও গুরুসেবা করিয়া চরিতার্থ হইত। আমারও ইচ্ছা হইত বাবাকে বাড়ীতে আনিয়া সাধ্যমত সেবা করি। বিশেষতঃ বাড়ীর ছেলেমেয়েরা এবং আত্মীয়-স্বজনেরা সর্ব্বদা অনুযোগ করিত—"আপনার যোগশক্তি সম্পন্ন গুরুদেবের কথা অনেক লোকের মুখেই শুনিতেছি। কিন্তু তাঁহাকে একবার চোখে দেখিতেও পাইলাম না। তাঁহাকে একবার আনিয়া আমাদিগকে দেখান।" তাহাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে না পারিয়া আমারও দুঃখ হইত। কিন্তু উপায় কি? বাবা ত কোন শিষ্য বাড়ী যান না। বাবার শিষ্য মণ্ডলী মধ্যে অনেক বড় লোক আছেন, কেহই ত বাবাকে বাড়ীতে লইয়া যাইতে পারেন নাই। কলিকাতায় দেখিয়াছি কেহ কেহ বাবাকে ভোগ দিবার জন্য নিজ বাড়ীতে লইয়া যান। বাবা সেখানে ২।৪ ঘণ্টা থাকিয়া ভোগের পর আবার আশ্রমে ফিরিয়া আসেন। আমার ত সেরূপ সুযোগও নাই। তবে আমার এ বাসনা কেন?—কেন জানি না, কিন্তু মাঝে মাঝে ইচ্ছা জাগিত।

বাবার ভোগ বরাবর সিদ্ধ পুরাতন রামশাল চাউলের অন্নের দ্বারা হইত। আমার চাষেও রামশাল ধান জন্মে। নিজ তত্ত্বাবধানে ঐ ধানে চাউল প্রস্তুত করাইবার সময় মনে হইল "এই চাউল যদি বাবার ভোগে লাগাইতে পারিতাম।" গুরুভ্রাতা ৺রোহিণীকুমার চেল দাদার চাউলের কারবার ছিল। বাবার ভোগের চাউল তিনিই পাঠাইয়া দিতেন। তাহার সঙ্গে আমি সামান্য চাউল পাঠাইয়া কি করিব? আমি উৎপন্ন চাউল পুরাতন

হইবার জন্য বাঁধাইয়া রাখিলাম। আমার বাগানে বাবার প্রিয় অনেক আনাজ জন্মিত, কিন্তু তাহা গুরুসেবায় লাগার কোন আশা নাই ভাবিয়া দুঃখ হইত।

আমার এই ইচ্ছা আংশিক পূরণের জন্য একবার বাবার অনুমতি লইয়া পূজনীয় দুর্গাদাদাকে দিন কয়েকের জন্য গুনুড়ী লইয়া গিয়াছিলাম। গুরুপুত্রের সেবা করিয়া আমার গুরুসেবার ইচ্ছা অনেকটা পূরণ হইল বটে, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনদের তাহাতে মোটেই তৃপ্তি হইল না। তাহারা যোগৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন একজন মহাপুরুষ দেখিবার আশা করিতেছিল, একটি নবীন যুবক দেখিয়া তাহাদের আশা মিটিবে কেন? বাস্তবিক সে সময়ে দুর্গাদাদা কিছু কিছু যোগক্রিয়া করিলেও বাহির তিনি পুরা বাবুই ছিলেন। আমার একটি দোনলা বন্দুক ছিল, তাহা দেখিয়া তাঁহার শিকারের ইচ্ছা হইল। সেই সময়ে ঝালদার রাজা ৺উদ্ধবচন্দ্র সিংহ দাদার মধ্যমপুত্র (হিকিম সাহেব) আমাদের নিকটবর্ত্তী তিলুড়ী হাই স্কুলে পড়িতেন। দুর্গাদাদা পত্র লিখিয়া তাঁহাকে গুনুড়ী আনাইলেন এবং তাঁহাকে কয়েক দিন থাকিতে বলিলেন। হিকিম সাহেব ভাল শিকারী ছিলেন। তিনি সকাল-বিকাল দুর্গাদাদার সঙ্গে বেড়াইতে যাইতেন এবং দুই একটা পক্ষী শিকার করিয়া আনিতেন। এইভাবে কয়েক দিন বেশ আনন্দে কাটিয়া গেল। ইহার পর একদিন দুর্গাদাদার আদেশক্রমে তাঁহাকে বর্দ্ধমানে রাখিয়া আসিলাম। গুরুপুত্রের সেবা করিয়া গুরুসেবার বাসনা আপাততঃ কিছু শান্ত হইলেও গুরুদেবকে বাড়ীতে আনিয়া সেবা করার প্রবল ইচ্ছা আবার জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

কল্পতরুর কাছে গেলে সকল ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। আমাদের বাঞ্ছাকল্পতরু বাবার কাছে আমার এই বাঞ্ছা অপূর্ণ থাকিবে কেন? পুত্রের কাতর প্রার্থনা তাঁহার মর্ম্মে আঘাত করিয়াছে। বোধ হয় সন ১৩৩৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের কথা। একদিন ৺পুরী আশ্রমে বাবার নিকট বসিয়া আছি। এমন সময়ে তিনি কথা প্রসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "একবার তোমাদের দেশটা দেখতে হবে গো।" শুনিয়াই আমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বুঝিলাম এই দেশ দেখার কথা উপলক্ষ্য মাত্র, আমার বহুকালের আশা পূর্ণ করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। আমি করজোড়ে বাবার এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম।

বাবার এই কথায় আনন্দিত হইলাম বটে, কিন্তু পরক্ষণেই নানা চিন্তা আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল। বাবাকে লইয়া যাইতে হইলে তাহার আয়োজন নিতান্ত অল্প নহে। নূতন খাট, বিছানা, মশারি, আসন, বাসন প্রভৃতি ত চাইই, কিন্তু "বাবাকে রাখিব কোথায়" এই সমস্যাই প্রধান হইল। বাড়ীর মধ্যে বাবাকে রাখা সম্ভব হইবে না। আমার বৈঠকখানা বাড়ী ভদ্রাসন হইতে পৃথক্ হইলেও লোকালয়ের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া সেখানে সর্ব্বদা গোলমাল হইয়া থাকে, তাহাতে বাবার বিশ্রাম ও ক্রিয়ার ব্যাঘাত হইবে। আমার বাগানের মধ্যে নিজের নির্জ্জন বাস ও সন্ধ্যা-পূজাদির জন্য একটি খড়ের ঘর ছিল। সেই ঘরের মধ্যে উইটিলা হওয়ায় তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি। তাহার পরিবর্ত্তে একটি নূতন ঘর করার ইচ্ছা থাকিলেও অদ্যাপি তাহা করা হয় নাই। এখন মনে হইল এইটিই খড়ের ঘর না করিয়া পাকা ঘ

অপেক্ষাকৃত বড় করিয়া নির্ম্মিত হইলে বাবাকে নূতন ঘরে আনা হইবে। স্থানটি খুব নির্জ্জন, বাবার মনেও লাগিবে। কাজটি ব্যয়-সাপেক্ষ হইলেও এই সঙ্কল্পই দৃঢ় করিলাম। ৺রথযাত্রার বিলম্ব ছিল না। বাবার সঙ্গে রথে জগন্নাথ দর্শন করিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিলাম।

আষাঢ় মাস, বর্ষা নামিয়া আসিতেছে, বেশী বর্ষা হইলে বুনিয়াদের কাজ করা কষ্টকর হইবে ভাবিয়া বাড়ী ফিরিয়াই ঘরের বুনিয়াদ কাটাইয়া আষাঢ় মাসের শেষে মাটীর লেবেল পর্য্যন্ত গাঁথনী করাইয়া ফেলিলাম। কৃষিকার্য্যের জন্য শ্রাবণ মাস বন্ধ রাখিয়া আবার ভাদ্রমাস হইতে কাজ চালাইতে লাগিলাম। ইতি-মধ্যে ৺জন্মাষ্টমীর সময় বর্দ্ধমান গিয়া বাবার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া আসিলাম। আমি যে বাবাকে গুস্কুড়ীতে লইবার জন্য বাগানে গৃহারম্ভ করিয়াছি, এই কথা জানাইয়া, বাবার শুভাগমনের কথা দ্বিতীয়বার অনুমোদন করাইয়া লইলাম। বাবা বলিলেন, "তোমার ঘর ত হোক, ৺শিবরাত্রির পর তোমার ওখানে যাবার ব্যবস্থা করা যাইবে।" আমি বর্দ্ধমান হইতে ফিরিয়া জোরের সহিত কাজ চালাইতে লাগিলাম। কার্ত্তিক মাসে, দুই কুঠরী ঘরের ছাদ প্রস্তুত হইয়া গেল। তাহার চারিদিকে কাঠের থাম দিয়া করগেট্ টীনের একটি সুদৃশ্য আটচালা ঘর প্রস্তুত হইল। মাঘ মাসের মধ্যে ঘরের মোটামুটি সমস্ত কাজ শেষ হইয়াছিল। বাবার শুইবার একটি চৌকী, জল চৌকী, টেবিল প্রভৃতি মিস্ত্রী দিয়া প্রস্তুত করাইয়াছিলাম। বাগানের তুলা দিয়া লেপ, তোষক, বালিশ, মশারি প্রভৃতি আসানসোলে প্রস্তুত করাইয়াছিলাম।

রোহিণীকুমার চেল দাদা আমার বরাত মত বাবার জন্য দুইখানা সুদৃশ্য গালিচার আসন (একটি আহ্নিক ও অপরটি ভোগের) ও সাদা পাথরের থালা গেলাস বাটী প্রভৃতি কাশী হইতে কিনিয়া দিয়াছিলেন। এইভাবে আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া ফাল্গুন মাসের প্রথমে বাবাকে লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলাম।

সন ১৩৩২ সাল ১৬ই আশ্বিন তারিখে কাশীর "বিশুদ্ধানন্দ কানন" আশ্রমে বাবা তাঁহার পিতৃদেবের নামে "শ্রীশ্রীঅখিলেশ্বর" নামক বাণলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সঙ্গে আরও এগার জন শিষ্য কর্ত্তৃক আরও এগারটি বাণলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হন। আমার মনে হয় ঐ বৎসর হইতেই কাশীতে ৺শিবরাত্রি ব্রতানুষ্ঠানও আরম্ভ হয়। এবার ব্রত একটু আগে হওয়ায় ৺শিবরাত্রি ও জন্মোৎসবের মধ্যে প্রায় এক মাসের ব্যবধান ছিল। আমার আশা হইয়াছিল—বাবা যদি এই সময় শুনুড়ী আসিয়া দিন কতক থাকিয়া যান তাহা হইলে ভাল হয়, কারণ আমাদের অঞ্চলে ফাল্গুন মাসটিই প্রকৃত বসন্তকাল। তখন একটু একটু শীত থাকে। বন্য পলাশ প্রভৃতি পুষ্পের শোভায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও ভাল হয়। চৈত্র মাসেই এখানে গরম পড়িয়া যায়। বাবাকে তদনুসারে পত্র লিখিলাম, কিন্তু বাবা তাহা অনুমোদন করিলেন না। তিনি জানাইলেন—"এখন শুনুড়ী যাওয়া হইবে না। কলিকাতায় জন্মোৎসবের কার্য্য শেষ করিয়া বর্দ্ধমানে ফিরিব, তথা হইতে শুনুড়ী যাইবার ব্যবস্থা করা যাইবে।" তাহাই হইল। তখনও ঘরটিতে দরজা জানালা ও দেওয়াল প্রভৃতিতে রংএর কাজ কিছু কিছু

বাকী ছিল, তাহা করাইয়া ফেলিলাম। বুঝিলাম, চৈত্র মাসের শেষ রাত্রিতে সামান্য শীত অনুভব হইলেও, আমি যে বাবার জন্য বাগানের তুলা দিয়া বালাপোষের মত লেপ প্রস্তুত করাইয়াছিলাম, তাহা আর কাজে লাগিবে না। দিনের বেলায় গরম হইবে ভাবিয়া বাবার শুইবার স্থানে টানাপাখা লাগান হইল।

২৮শে ফাল্গুন কলিকাতায় গিয়া বাবার শ্রীচরণ বন্দনা করিলাম। ২৯শে ফাল্গুন ৭ নং কুণ্ডুরোড, যোগেশচন্দ্র বসু দাদার বাড়ীতে "জন্মোৎসব" যথা বিধানে সুসম্পন্ন হইল। সন্ধ্যার পর বাবা আহ্নিক করিয়া উঠিলে আমি করজোড়ে আমার কাতর আহ্বান জানাইলাম। বাবা পঞ্জিকা দেখিয়া ৫ই চৈত্র (সন ১৩৩৩ সাল) দিন স্থির করিয়া দিলেন। আমি উৎসবের দিন উপস্থিত গুরুভ্রাতাদের অনেককে বাবার সঙ্গে আমার বাড়ী যাইবার আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলাম। বাবা নিজেও অনেককে বলিয়াছিলেন, তাঁহারাও সানন্দে সম্মতি জানাইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কলিকাতার কেহই আমার বাড়ী যান নাই। আমি পরদিন প্রাতঃকালে বাবাকে প্রণাম করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলাম। এ সময় আর বিলম্ব করা অনুচিত বোধে বাবাও সম্মতি দিলেন। আমি যথাকালে বাড়ী ফিরিলাম।

বাবাকে আনিবার জন্য আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ নলিনাক্ষকে বর্দ্ধমান পাঠাইয়া দিলাম, বাবার অভ্যর্থনা-অনুষ্ঠান, ষ্টেশনে যান-বাহনাদির ব্যবস্থা এবং বাড়ীর অন্যান্য আয়োজনের জন্য আমি বাড়ীতে থাকিয়া গেলাম। বিকাল ৪টার সময় ট্রেণ মধুকুণ্ডা (তৎকালিক মুরুলিয়া) ষ্টেশনে আসিয়া পঁহুছিবে, আমি ৩টার

পূর্ব্বেই যানাদি পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলাম। আমার নিজের একটি পালকী ছিল, তাহার ব্যবহার কম হইত, অধিকাংশ সময় আড়াচে তোলা থাকিত। ঐদিন নামাইয়া ধোয়া-মোছা করিয়া পালকীর ভিতর বিছানা বালিশ দিয়া ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিলাম। বাবার মহিমা প্রচার করিবার জন্যই পালকীর প্রধান দোষটি অলক্ষিত থাকিয়া গেল, তাহা পরে বলিব। গো-গাড়ীটিতে টোপর বাঁধা ছিল। আদেশ পাইবামাত্র কৃষাণ পানু বাউরী প্রধান বলদ দুইটি জুড়িয়া ষ্টেশন যাত্রা করিল। ষ্টেশন আমার বাড়ী হইতে এক মাইলের বেশী নহে। কলিকাতার বাবুদের আসার কথা আছে, কিন্তু তাহাদের জন্য আমাদের পাড়াগাঁয়ে গো-যান ব্যতীত অপর কোন উপায় নাই। যদি কেহ আরোহী থাকেন এই ভাবিয়া সহিসকে ডাকিয়া ঘোড়া সাজাইয়া লইয়া ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিলাম। মোট বহিবার জন্য দুইজন বাড়ীর চাকর পাঠাইলাম।

আজি আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। শ্রীশ্রীবাবা আমার গৃহে শুভাগমন করিতেছেন, আজ তাঁহার পূত পদধূলি সংস্পর্শে আমার গৃহ পবিত্র হইবে। মধ্যে মধ্যে আমার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিতেছে। আমি শুভাগমন-জ্ঞাপক মাঙ্গল্য-দ্রব্যে ঘর দ্বার সাজাইয়াছিলাম। ইচ্ছা করিলে আমি অনেক কিছু আড়ম্বর করিতে পারিতাম, কিন্তু বাবা কখনও আড়ম্বর ভালবাসেন না। তাঁহার বিরক্তির ভয়ে কোন বিশেষ অনুষ্ঠান করি নাই। পাছে লোকের ভিড় হয় এইজন্য গ্রামের বা পাড়ার কাহাকেও আবাহন করি নাই। বাড়ীর মেয়েছেলে ও দুই

চারিজন খুব নিকট আত্মীয় লইয়া বাবার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমার নিজ বাটীর সদর দরজার ও বাগানের ফটকের উভয় পার্শ্বে সপল্লব পূর্ণঘট স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহার নীচে শ্বেতধান্য ও উপরে দূর্ব্বা দিয়া সাজান হইয়াছে। দ্বারে দ্বারে বনমালা টাঙ্গান হইয়াছে। ঘরটিও পুষ্পমাল্য বনমালার দ্বারা সাজান হইয়াছে। গৃহদ্বারে দুইদিকে কলাগাছ পুঁতিয়া তাহার নীচে ঐরূপ পূর্ণঘট দিয়া সাজান হইয়াছে।

সময় যত নিকটবর্ত্তী হইতেছে হৃদয়ের চাঞ্চল্য ততই কমিতেছে। চারটা বাজিতে আর বিলম্ব নাই, ট্রেণ গুড়্গুড় করিয়া দামোদর পুলের উপর চড়িল; আমার হৃদয়ও আনন্দ এবং উৎকণ্ঠায় গুরগুর্ করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে ট্রেণ ষ্টেশনে আসিয়া থামিল ও দুই তিন মিনিট পরে বাঁশী ফুঁকিয়া চলিয়া গেল। আর পনর মিনিট মধ্যে বাবা আসিয়া পঁহুচিবেন। বারবার ঘড়ি দেখিতেছি, পনর মিনিট পার হইল, কাহারও দেখা নাই। রাস্তার দিকে তাকাইয়া আছি, কুড়ি মিনিট হইয়া গেল। এত বিলম্বের ত কোন কারণ নাই। তবে কি বাবা আসেন নাই? ভয়ে অন্তর শুখাইয়া গেল। কিন্তু আসা না হইলে যে লোক-জন ফিরিয়া আসিত। আর বেশীক্ষণ ভাবিতে হইল না—আমার সদর দরজার নিকট বাবার পাল্কী দেখা দিল—দেখিলাম সঙ্গে সঙ্গে নলিন অশ্বারোহণে আসিতেছে। আমার এবং হরিশের স্ত্রী পূর্ণঘট হস্তে দ্বারের দুই পার্শ্বে দাঁড়াইল, মেয়েরা শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি করিয়া উঠিল; আমি একটু অগ্রসর হইয়া পাল্কীর পার্শ্বে গিয়া জোড়হাতে বাবাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইলাম। পাল্কী ফটক অতিক্রম

করিয়া বাগানবাড়ীর সম্মুখে আসিয়া থামিল, আমরা সকলে পাল্কীর নিকটে গেলাম। বাবা মধুর হাসি হাসিতে হাসিতে পাল্কী হইতে নামিলেন। আমরা একে একে প্রণাম করিলাম। মেয়েরা চরণ স্পর্শ করিয়া পদধূলি লইল। বাবার জন্য সম্মুখের বারাণ্ডায় একখানা ইজিচেয়ার পাতা ছিল। বাবা বারাণ্ডায় উঠিয়া তাহাতে উপবেশন করিলেন। আমার স্ত্রী নিকটে আসিয়া বাবার চরণযুগল একটি বড় থালার উপর স্থাপন করিল। হরিশের স্ত্রী একটি ঘটিতে করিয়া জল আনিয়া ঢালিয়া দিতে লাগিল। উভয়ে মিলিয়া বাবার পদ ধৌত করিলে, আমরা সকলে তাঁহার পাদোদক পান ও মস্তকে ধারণ করিয়া ধন্য হইলাম।

এই সময়ে অণ্ডালের মুনীন্দ্রমোহন কবিরাজ দাদা, রাসবিহারী দে দাদা ও ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পাচক) আসিয়া উপস্থিত হইল। শুনিলাম উপস্থিত তাহারা তিনজন ব্যতীত বাবার সঙ্গে আর কেহ আসেন নাই। তাহাদের সঙ্গে আলাপ সম্ভাষণ শেষ হইলে বাবা আমার দিকে তাকাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বাপু, তোমার পাল্কী এবং বাহকগণ আমাকে বহন করিয়া আনে নাই, আমাকেই তোমার পাল্কী বহন করিয়া আনিতে হইয়াছে। বিশ্বাস না হয় তোমার বাহকদিগকে জিজ্ঞাসা কর।" বাবার কথা শুনিয়া কিছুই মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে পারিলাম না। ভীতিবিহ্বলচিত্তে বাহকদের নিকট গিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় তাহারা সকলে গোলমাল করিয়া যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—তাহারা পাল্কী সাজাইবার সময় তাহার বাঁধনগুলি ঠিক আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখে নাই। খালি পাল্কী

লইয়া যাইবার সময় কিছুই বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু বাবাকে বসাইয়া পাল্কী উঠাইয়াই ভীতভাবে তৎক্ষণাৎ পাল্কী মাটীতে নামাইল। পাল্কীর বাঁট তুইটি চারিখানা করিয়া লোহার রড দ্বারা পাল্কীর চারিকোণে বোল্ট ও নাট দিয়া লাগান থাকে। আটটি বোল্টেরই নাটগুলি অল্প বিস্তর ঢিলা হইয়া গিয়াছিল, তন্মধ্যে তিনটির অবস্থা খুবই খারাপ হইয়াছিল। পাল্কীর ঝাঁকানিতে নাটগুলি ঘুরিতে ঘুরিতে বোল্টের শেষ প্রান্তে পঁহুচিয়াছিল, আর তুই এক পাক ঘুরিলেই নাটগুলি খুলিয়া পড়িয়া যাইত। তাহার ফলে টান রড হইতে পাল্কী আল্গা হইলেই বাবার ওজনে বাঁট ভাঙ্গিয়া যাইত। পাল্কী উঠাইতেই ওজন পাইয়া বাঁট বাঁকা হইয়া নীচের দিকে ঝুঁকিয়া যাওয়ায় তাহারা পাল্কী নামাইয়া বাবাকে বলিল, "বাবা, আপনাকে একটুকু অপেক্ষা করিতে হইবে; আমরা নিকটবর্ত্তী দোকান হইতে দড়ি আনিয়া শীঘ্র পাল্কীটি বাঁধিয়া লইতেছি। নচেৎ বিপদের সম্ভাবনা আছে।" বাবা আদেশ দিলেন, "তোমরা পাল্কী উঠাও, ভয়ের কোন কারণ নাই।" তাহারা ইতস্ততঃ করিয়া শেষে পাল্কী উঠাইয়া দেখিল, পাল্কী হাল্কা হইয়া গিয়াছে, এখন আর ওজনে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে না, যেমন খালি পাল্কী আনিয়াছিল যেন তেমনি খালি লইয়াই চলিল। বরং ষ্টেশনে আসিবার সময় পাল্কী ঢিলা থাকায় ক্যাচ্-ক্যোচ্ শব্দ হইতেছিল, এখন আর তাহাও নাই। কে যেন ইহাকে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিয়াছে। আমি শুনিয়াই ব্যাপার সব বুঝিতে পারিলাম। পাল্কীর অবস্থা বুঝিয়া বাবা নিজগুণে লঘু হইয়াছিলেন। পাল্কী দোল খাইলে নাটগুলি খুলিয়া পড়িতে পারে,

এইজন্য নিজ শক্তিতে পাল্কীটিকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি বাহকগণকে পাল্কীটি সম্মুখ হইতে সরাইয়া একপাশে রাখিতে বলিলাম। অবশ্য মেরামত করাইয়া যথাস্থানে রাখিতে হইবে। আমি তাহাদিগকে বক্সিস দিয়া বিদায় দিলাম এবং বাবার নিকট আসিয়া আমার এই অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। বাস্তবিকই আমার বাড়ী না পঁহুচিতেই পথে বাবাকে এই কষ্ট পাইতে হইল বলিয়া আমার খুব দুঃখ হইয়াছিল। বাবা আমার বিষাদভাব দেখিয়া একটু অনুযোগের স্বরে বলিলেন, "তোমার ইহাতে ত কোন দুঃখের কারণ দেখি না। তুমি ইচ্ছা করিয়া আমার জন্য ভাঙ্গা পাল্কী পাঠাও নাই এবং আমি ষ্টেশনে একটুকু অপেক্ষা করিলেই বাহকগণ দশ পনর মিনিটের মধ্যে পাল্কীটি শক্ত করিয়া বাঁধিয়া আমাকে লইয়া আসিতে পারিত। আমি স্বেচ্ছায় যাহা করিয়াছি তাহাতে তোমার দোষ কোথায় ?" এইরূপ নানা কথায় তিনি আমাকে শান্ত করিলেন। মুনীন্দ্র দাদা আমাকে একটুকু একান্তভাবে বলিলেন—"এ খেলোয়ারের খেলা, গৌরী দাদা। বাবা আসিবার পথে একটা খেলা দেখাইলেন।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

একটা কথা আছে "আগুন কি খড় চাপা থাকে ?" অর্থাৎ থাকে না, বরং খড় পাইয়া সঙ্গে সঙ্গে জ্বলিয়া উঠে। বাবার কাছে অধিক লোক সমাগমের ভয়ে আমি বাবার আগমন সংবাদ জানাই নাই, কিন্তু বাবা নিজ প্রভাবে তাহা অল্প সময়ের মধ্যে রাষ্ট্র করিয়া দিলেন। বাহকগণ বাগান হইতে বাহির হইয়াই

বাবার এই আশ্চর্য্য শক্তির কথা যাহাকে দেখিতে পাইল তাহার নিকটই প্রকাশ করিতে লাগিল। একজন অপরের নিকট বলিল, এইভাবে এক ঘণ্টার মধ্যে বাবার আগমন সংবাদ ও যোগৈশ্বর্য্যের কথা গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বহুলোক বাবাকে দেখিতে আসিল। বাহকগণ সন্ধ্যার সময় মদ খাইতে গিয়া শুঁড়ির দোকানে মদের মুখে এই ব্যাপার অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করিল। অন্যান্য গ্রামের লোক সেখানে মদ খাইতে আসিয়াছিল। তাহারা নিজ নিজ গ্রামে গিয়া বাবার আগমন-বার্ত্তা প্রচার করিল। দুই এক দিন মধ্যে পাঁচ সাতখানা গ্রামে বাবার আগমন সংবাদ প্রচারিত হইল। দলে দলে লোক আসিয়া বাবাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া চরিতার্থ হইল। বাবা যে বলিয়াছিলেন "তোমাদের দেশটা দেখতে হবে", তাহার অর্থ এখন বুঝিতে পারিলাম। বাবা দেশ দেখার ছলে আমার দেশবাসীকে দর্শন দান করিয়া চরিতার্থ করিলেন।

সন্ধ্যা হইল, বাবা আহ্নিকের জন্য উঠিলেন। আমি তৎপূর্ব্ব হইতে রাসবিহারীকে লইয়া বাবার আহ্নিকের স্থান ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম। নূতন কুশাসন স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছিলাম, গালিচার আসন ও রেশম বস্ত্র পূর্ব্বেই কেনা হইয়াছিল। বাগানে হাওয়া বেশী বলিয়া মোমবাতি দিবার জন্য একটি বড় চতুষ্কোণ লণ্ঠন বাড়ীতে মিস্ত্রী দিয়া প্রস্তুত করাইয়াছিলাম। বাবার আহ্নিকের ব্যাগটি রাখার জন্য তদনুরূপ একটি লম্বা চৌকী নির্ম্মিত হইয়াছিল। ধূপাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আমি বাড়ী গিয়া সংক্ষেপে আহ্নিক সারিয়া লইলাম।

সেই সময় অলবণ মুড়ির গুঁড়া, আদা বাঁটা ও দুধ দিয়া বাবার রাত্রির ভোগ হইত। আমার বাড়ীর প্রস্তুত চাষের ধানের মুড়ির চাউল হইতে বাড়ীতে অলবণ মুড়ি ভাজা হইয়াছিল, বাড়ীতে গাভী-দুগ্ধেরও অভাব ছিল না। ভোলানাথ গাভী দোয়াইয়া দুধ জ্বাল দিয়া লইতেছিল। সে বাবার সঙ্গে আসায় অনেকটা সুবিধা হইয়াছিল। ভোলানাথের বাড়ী আমাদের নিকটবর্ত্তী বালিতোড়া গ্রামে। আমার বাড়ীতে আট দশ বৎসর পাচকের কার্য্য করিয়া সে ঘরের ছেলের মত হইয়া গিয়াছিল। পশ্চিমা পাচকের রান্নায় বাবার সেবা ভাল হইতেছে না, এই কথা দুর্গাকান্ত দাদার মুখে শুনিয়া আমি ভোলানাথকে কাশী পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। ভোলানাথকে বাবার ভোগের আয়োজন করিতে বলিয়া আমি বাবার নিকট আসিলাম। আসিয়া দেখিলাম বাবা আহ্নিক শেষ করিয়া বিছানার উপর বসিয়া আছেন, মুনীন্দ্র দাদা পাখা টানিতেছেন, আরও দুই একজন লোক বসিয়া আছে। বাবাকে বেশ প্রফুল্ল দেখিলাম। এই বাগান সম্বন্ধেই কথা হইতেছিল। কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম স্থানটি বাবার ভাল লাগিয়াছে। প্রায় পাঁচ একর জমীর উপর এই বাগান নির্ম্মিত, ইহার চারিদিক্ ইষ্টক প্রাচীর বেষ্টিত, ইহা উত্তর দক্ষিণে লম্বা। ইহার দক্ষিণ পূর্ব্ব দিক্ লোকালয় সংলগ্ন; এই অংশেই আমার বৈঠকখানা। বাগানের উত্তর পশ্চিম দিক্ খুব ফাঁকা, নিকটে কোন লোকালয় নাই। পূর্ব্ব পশ্চিমে বহুদূরব্যাপী উন্মুক্ত প্রান্তর। এই স্থানটিতেই বাবার জন্য গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। নির্জ্জন বলিয়াই বাবার এই স্থানটি খুব মনে লাগিয়াছিল। কথাবার্ত্তায় আটটা বাজিয়া গেল,

ভোলানাথ ভোগের আয়োজন করিয়া আনিলে বাবা সেবায় বসিলেন, আমরা গল্প করিতে লাগিলাম। বাবার ভোগ হইয়া গেলে বাবা বিছানায় শুইয়া পড়িলেন, মুনিদাদা পদসেবা করিতে লাগিলেন, আমি পাখা টানিতে লাগিলাম। রাত্রির জন্য পাঙ্খা-কুলীর কথায় বাবা বলিলেন—"এখন ক্রমে ঠাণ্ডা পড়িতেছে, আর পাঙ্খা কুলীর কোন প্রয়োজন হইবে না।" নয়টা বাজিলে বাবা আমাদিগকে মশারি ফেলিতে বলিলেন, কিন্তু মশারি ফেলা হইল না। আমার ও হরিশের স্ত্রী তেলের বাটী হাতে লইয়া বাবার পদপ্রান্তে উপস্থিত হইল, পদসেবা করিবে। বাবার পায়ে তেল দেওয়া অভ্যাস আছে কিনা জানি না, কিন্তু বাবা তাহাদের সেবা গ্রহণ করিলেন। তাহারা পদসেবা করিতে লাগিল, আমরা প্রসাদের পাত্র লইয়া বাড়ী আসিলাম। বাবার পাত্রাবশেষ সকলকে একটু একটু করিয়া ভাগ করিয়া দিয়া আমরাও প্রসাদ লইয়া তিন জনে একত্রে বসিয়া ভোজন করিলাম। ভোজনান্তে তিনজনে বাগান বাড়ীতে ফিরিয়া গেলাম। বাবার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া মুনিদাদা ও রাসবিহারী দ্বিতীয় কক্ষে শয়ন করিল। আমার নিযুক্ত দুইজন প্রহরী ইতিপূর্ব্বে বারাণ্ডায় আসিয়া শুইয়াছিল। আমি মেয়েদের সঙ্গে লইয়া বাড়ী ফিরিলাম।

সকালে আসিয়া দেখিলাম,—বাবা আহ্নিক করিয়া উঠেন নাই, রাসবিহারী দাদা বেদানার রস প্রস্তুত করিতেছে। মুনীন্দ্র দাদা কতকগুলি তরকারী সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বারাণ্ডায় রাখিলেন। সাতটার সময় বাবা আহ্নিক করিয়া উঠিলেন, আমরা সকলেই বাবাকে প্রণাম করিলাম। বাবা "কিগো, কি হচ্ছে সব" বলিয়া

সম্ভাষণ করিয়া বারাণ্ডায় ইজি চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। সম্মুখে তরকারীর ঝুড়ি দেখিয়া বাবা খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। বাবা আসিবেন বলিয়া অনেক শীতের আনাজ নামী করিয়া লাগাইয়াছিলাম। বাবা মটর শুঁটী ভালবাসিতেন, কাঁচা মটর সিদ্ধ করিয়া সেগুলি চটকাইয়া তাঁহার ভোগ হইত। এই সময় রাসবিহারী দাদা বেদানার রস আনিয়া বাবার হাতে দিল। বাবা তাহা পান করিয়া ভ্রমণে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পূর্ব্বদিনের নির্দ্দেশ মত চিন্তামণি বাবার সঙ্গে ভ্রমণে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিল ও বাবাকে প্রণাম করিল। চিন্তামণি দাসগুপ্ত (বৈদ্য) আমার নিকট প্রতিবেশী, বাবার আসার পর হইতেই সে তাঁহার কাছে থাকিত। সে দুই চারি দিন মধ্যেই তাঁহার খুব অনুরক্ত হইয়া পড়িল এবং কুলগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেও বাবার নিকট পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করিল।

এই সময় অনেক লোক বাবাকে দর্শন করিবার জন্য প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছিল; তাহারা একে একে আসিয়া বাবাকে প্রণাম করিল। বাবা তাহাদের কাহারও কাহারও সঙ্গে একটু মধুর আলাপ করিয়া চিন্তামণির সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইলেন। দর্শকদের মধ্যে দুই চারিজন বাবার অনুগমন করিল। আমরা বাবার সঙ্গে না গিয়া তাঁহার ভোগের আয়োজন করিতে লাগিলাম। আট-চালার একপার্শ্বে একটুকু স্থান অস্থায়িভাবে ঘেরা করিয়া ভোগ-রান্নার স্থান করিয়াছিলাম। ভোলানাথ সকালেই দুইটি টিনের চুলায় আঁচ দিয়াছিল। আগুন প্রস্তুত হইলে রান্না আরম্ভ করিল। নীরদদা তরকারী কুটিতে লাগিলেন। শাক বাবার

ভোগে লাগে তাহা আমি জানিতাম না। দাদা অবাদী অনাবাদী নানা প্রকার শাক তুলিয়া রোজ রোজ বাবার ভোগে লাগাইতেন। আমার চাষের রামশাল ধান হইতে চাউল প্রস্তুত করিয়া পুরাতন করিয়া রাখিয়াছিলাম, আজ তাহা বাবার ভোগে লাগায় আমার বহুকালের আশা পূর্ণ হইল। বাবা তখন অলবণ সেবা করিতেন, ভোগের সময় সামান্য লবণ ও গোলমরিচের গুঁড়া পৃথক্ পাত্রে দিতে হইত। হলুদ ও ধন্যা ছাড়া অন্য মশলা লাগিত না। লঙ্কার ত কথাই নাই। বাড়ীর মেয়েরা আসিয়া বাটনা বাটিয়াছিল। মশলা ব্যতীত বাদাম এবং কিসমিসও বাটিতে হইল। বাবার দাঁত তখন পড়িয়া না গেলেও দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছিল, এইজন্য অনেক খাদ্যই বাটিয়া ও ছেঁচিয়া দিতে হইল। পাকা পেঁপে বাবার ভোগে লাগিত, এইজন্য কিছু পাকা পেঁপে যোগাড় করিয়া রাখিয়াছিলাম। গুন্নুড়ীতে ভাল দই হইত বলিয়া প্রত্যহই প্রস্তুত করাইয়া বাবার ভোগে লাগাইতাম।

বেলা নয়টার সময় বাবা ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। চিন্তামণি বলিল, "বাবাকে আজ 'জোড়' দেখাইয়া আনিলাম। বাবা জোড় দেখিয়া খুব খুসী হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, 'এটি দেখিবার যোগ্য স্থান বটে'।" জোড় একটি ক্ষুদ্র নদী, গুন্নুড়ীর পশ্চিম দিকে উত্তরবাহিনী হইয়া গিয়া দামোদরের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী ও অসমতল ভূমি হইতে বর্ষার অগাধ জলরাশি এই প্রস্তরময় ভূমি অতিক্রম করিবার সময় বহুকালে এইস্থানে নানা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছে। কোন স্থানে জলরাশি উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া জলপ্রপাত সৃষ্টি করিয়াছে,

তাহার ফলে স্থানে স্থানে গভীর জলপূর্ণ কুণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে। এই কুণ্ডগুলিকে দ বা দহ বলে। এই কুণ্ডগুলির মধ্যে কোন কোনটির গভীরতা পঞ্চাশ ষাট হাতের অধিক। জলের গভীরতা নির্ণয় করিতে না পারিয়া লোকে অতলস্পর্শ বলে। স্থানে স্থানে সুড়ঙ্গ কূপ স্তম্ভ প্রস্তুত হইয়া একটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। এইস্থানে নদীটি একটি পাথর ঢালের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, কোথাও মাটী নাই। বর্ষার সময় এইস্থানটি অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে ; এই দৃশ্য দূর হইতে দেখিতেও ভয় হয়। জলস্রোতে দামোদর হইতে অনেক মাছ উঠিয়া আসিয়া এই দহগুলিতে জমা হয়, কিন্তু জল-প্রপাত অতিক্রম করিয়া মাছগুলি আর উপরে যাইতে পারে না। তাই দুঃখে কাঁদিতে থাকে। এইজন্য ইহাকে "মাছকান্নার দহ" বলে। চক্ষে না দেখিলে ইহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হইবে না। প্রবাদ আছে—কোন প্রাচীন যুগে দেবতারা এইস্থানে তাঁহাদের ক্রীড়াভূমি প্রস্তুত করিতেছিলেন, এমন সময়ে মুরগী ডাকিয়া উঠিল, প্রভাত নিকট জানিয়া তাঁহারা স্থানটি অর্দ্ধ সম্পন্ন করিয়াই চলিয়া গেলেন। আর শেষ হইল না। এখানে প্রস্তরের উপর নানা প্রকার জীবজন্তুর পদচিহ্ন আছে। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ অনুমান করেন, পূর্ব্বকালে এইখানে ভূগর্ভদুর্গ ছিল। কালে ইহাতে জলস্রোত প্রবেশ করিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ইহাকে বর্ত্তমান অবস্থায় আনয়ন করিয়াছে।

বাবা একটু বিশ্রাম করিয়া হাতমুখ ধুইয়া দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে কৌচের উপর উপবেশন করিলেন। ঘরটির পূর্ব্ব দিকের বারাণ্ডাটি

সদর ছিল, সকালবেলা এখানে রৌদ্র প্রবেশ করায় টীনের চাল গরম হইলে বাহিরে বসার সুবিধা হইত না। কিন্তু বিকাল বেলায় এই উন্মুক্ত বারাণ্ডাটি বেশ আরামপ্রদ হইত। একটুকু বিশ্রাম করার পর বাবার ভোগের সময় হইল, বাবা ভোগে বসিলেন। আমার কৃষিজাত দ্রব্যে বাবার ভোগ দিয়া নিজেকে চরিতার্থ মনে করিলাম, আমার বহুদিনের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। বাবা ভোজন শেষ করিয়া বিছানায় বসিলেন এবং ছেঁচা পান দিয়া মুখশুদ্ধি করিলেন। মুনীন্দ্র দাদা পাখা টানিতে লাগিলেন, আমি আর বিলম্ব না করিয়া দাদাদের এবং গৃহাগত অন্যান্য আত্মীয়দের ভোজনের সুব্যবস্থার জন্য বাড়ী গেলাম। মেয়েরা আসিয়া বাবার ভোগের থালা বাড়ী লইয়া গেল।

আমাদের প্রসাদ গ্রহণের পর মেয়ে-ছেলে ও চাকর-বাকরদের ভোজন শেষ করিয়া বেলা দুইটার পর বাবার নিকট ফিরিয়া আসিলাম। আমার বাড়ী হইতে বাগানবাড়ী আসিবার জন্য সদর ফটক ব্যতীত বৈঠকখানা বাড়ী দিয়া একটি সোজা পথ আছে। এই পথে আসিতে হইলে বাগানের মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর পাড় দিয়া আসিতে হয়। আমি এই পুষ্করিণীর পাড়ের শেষ প্রান্তে একটি আমগাছের তলায় দাঁড়াইয়া দেখিলাম—বাবা পূর্ব্বদিকের বারাণ্ডায় ইজি চেয়ারে চক্ষু মুদিয়া শুইয়া আছেন। সম্মুখে গালিচা পাতা আছে, তাহাতে মুনীন্দ্র দাদা, রাসবিহারী দাদা, আমার গৃহাগত দুইজন আত্মীয় এবং চিন্তামণি প্রভৃতি পাড়ার দুই এক জন লোক চুপ করিয়া বসিয়া আছে। আমার দুই বৎসরের মেয়ে

রতি* সম্মুখস্থ পদ্মকরবী গাছের গোড়া হইতে ছুই একটি করিয়া স্যুয়োর গুঞ্জা† ফুল তুলিয়া সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিয়া ঐ ফুলগুলি বাবার বাঁ-হাতে দিতেছিল। বাবা সেই ফুলগুলি ডাইন হাতে রাখিয়া আবার বাঁ-হাত পাতিতেছিলেন। রতি আবার ফুল তুলিয়া আনিয়া বাবার হাতে দিতেছিল। কতক্ষণ হইতে যে এইরূপ চলিতেছিল জানি না। আমি ছুই এক মিনিট দূর হইতে তাহা দেখিয়া একটু বিরক্তভাবে রতিকে বলিলাম,—"বোকা মেয়ে! এ কি করিতেছিস্, বাগানে এত ভাল ফুল থাকিতে বাবাকে স্যুয়োর গুঞ্জা ফুল দিতেছিস্?" আমার কথাটা একটু উচ্চকণ্ঠে হইয়াছিল, তাহাতে বাবার আলস্য ভাব কাটিয়া গেল। তিনি

---

* শ্রীমতী রতিবালা দেবী আমার ছেলেমেয়েদের মধ্যে সকলের ছোট। বর্ত্তমান সময়ে তাহার বয়স ত্রিশ বৎসর। তাহার একটি কন্যা ও তিনটি পুত্র হইয়াছে। জামাতা শ্রীমান্ সুধাকর মুখোপাধ্যায় বাবাজীবন ইলেক্‌ট্রিক সুপারভাইজারী পাশ করিয়া বার্ণপুর ইণ্ডিয়া আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর কারখানায় কাজ করিতেছে। শ্রীশ্রীবাবার কৃপায় তাহাদের কোন প্রকার অস্বচ্ছলতা নাই।

† স্যুয়োরগুঞ্জা এক জাতীয় তৈল বীজ। ইহা আমাদের দেশের ডাঙ্গা জমীতে জন্মে। এইগুলি অগ্রহায়ণ মাসেই পাকিয়া যায়। পৌষ মাসে ইহার গাছগুলি কাটিয়া আনিয়া বাগানবাড়ী সম্মুখে খামার করিয়া মাড়া হইয়াছিল। মাড়িবার সময় ইহার বীজ ছিটকাইয়া গিয়া ফুল গাছের গোড়ায় পড়িয়াছিল। ফুল গাছে জল দেওয়ার সময় জল পাইয়া ঐ বীজগুলি হইতে গাছ জন্মিয়া এ সময় অনেকগুলি ফুল ফুটিয়াছিল। ইহার ফুলগুলি দেখিতে একপাতা গাঁদা ফুলের ন্যায়, রংও গাঁদাফুলের মত। ফুলগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর, কিন্তু গন্ধ ভাল নহে।

“কি হলো” বলিয়া চক্ষু খুলিয়া সোজা হইয়া বসিলেন। আমি বলিলাম, “দেখুন দেখি বাবা, বাগানে এত ফুল থাকিতে আপনাকে এই দুর্গন্ধ ফুলগুলা আনিয়া দিতেছে।” বাবা যেন একটু বিরক্তভাবেই বলিলেন,—“ও যে কি দিতেছে এবং আমি যে কি লইতেছি তুমি তাহার কি জানিবে? এই দেখ দুর্গন্ধ না সুগন্ধ ফুল।” এই বলিয়া হাতের ফুলগুলি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। ফুলগুলি আসনের উপরে ও সিঁড়িতে ছড়াইয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থানটি গোলাপ গন্ধে ভরিয়া গেল। আমরা সকলেই দুই একটি করিয়া ফুলগুলি কুড়াইয়া লইয়া দেখিলাম,—ফুলগুলি আকারে সূয়োর গুঞ্জা ফুলের মত থাকিলেও তাহার নিজ গন্ধ চলিয়া গিয়া সুস্নিগ্ধ গোলাপগন্ধময় হইয়া গিয়াছে। অপরাপর সকলকে দেখাইবার জন্য সকলেই ফুলগুলি আপন আপন বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিল। ফুলগুলি শুখাইয়া গেলেও শেষ পর্য্যন্ত গোলাপগন্ধময় ছিল। আমার দোষ হইয়াছে বলিয়া আমার কৃত কর্ম্মের জন্য বাবার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। অল্পক্ষণ পরে পাড়ার কিশোরীমোহন দাশগুপ্ত* আসিয়া বাবাকে প্রণাম

---

* কিশোরীর পিতা এবং পিতামহ কীর্ত্তন গায়ক ছিলেন। তাঁহাদের বাড়ীতে দুইজন প্রসিদ্ধ খোল বাদকও ছিলেন, কিন্তু কিশোরীর পিতার পরলোক প্রাপ্তির দুই এক বৎসর আগে পাছে কীর্ত্তনের দলের সকলেই পরলোক গমন করেন। কিশোরী অল্পবয়স্ক থাকায় তাহার পিতার নিকট কীর্ত্তন শিখিতে পারে নাই। গ্রাম হইতে এত বড় সংগীত বিদ্যা লোপ হইতে চলিল দেখিয়া আমি এ বিষয়ে একটু উদ্যোগী হইয়াছিলাম। গুলুড়ীর আখড়ায় একজন বৃদ্ধ বাবাজী (বৈষ্ণব) ছিলেন। তিনি খুব ভাল কীর্ত্তন-

করিল। সে করজোড়ে প্রার্থনা করিল,—বাবা অনুমতি করিলে তাহারা সন্ধ্যার পর আসিয়া বাবাকে একটুকু পালা কীর্ত্তন গান শুনায়,—বাবা অনুমতি দিলেন।

অদ্য বিকালে বাবা আর বাহিরে বেড়াইতে গেলেন না, বাগানের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, বাবা হাত মুখ ধুইয়া সন্ধ্যা করিতে ঢুকিলেন। এই সময়ে কীর্ত্তনের দল একে একে আসিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিল। বাবা আহ্নিক করিয়া বাহির হইলে আমরা সকলে প্রণাম করিলাম, বাবা আসিয়া ইজি চেয়ারে বসিলেন। বাবার অনুমতি লইয়া কিশোরী কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। বাবা প্রায় দুই ঘণ্টা

গায়ক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার খিটখিটে মেজাজের জন্য কেহ তাঁহার নিকট গান শিখিতে চেষ্টা করে নাই। আমি বাবাজীর নিকট কীর্ত্তন শিখিতাম। পরে কিশোরী প্রভৃতি তিন চারি জন যুবককে লইয়া তাহার আলোচনা করিতাম। কিশোরীর কণ্ঠ-স্বর ভাল ছিল। তাহার সুর ও তাল জ্ঞান ভাল থাকায় কয়েক বৎসর মধ্যে সে ভাল কীর্ত্তন-গায়ক হইয়া উঠিয়াছিল। দুঃখের বিষয় কয়েক মাস পূর্ব্বে সে ক্যান্সার রোগে পরলোক প্রাপ্ত হওয়ায় আবার শুনুড়ী হইতে কীর্ত্তন গান লোপ হইতে চলিল।

শুনুড়ী গ্রামে দুই ভাই ধ্রুপদ গানের বড় ওস্তাদ ছিলেন। সেই সময় দূরাগত বহু ছাত্র তাঁহাদের নিকট গান-বাজনা শিখিতে আসিত। সেই সময় শুনুড়ীতে সংগীতের এত আলোচনা হইত যে লোকে ইহাকে ছোট বিষ্ণুপুর বলিত। তাঁহাদের পরলোক প্রাপ্তির পর আমি ইহা রক্ষা করিবার জন্য তানপুরা, পাখোয়াজ প্রভৃতি কিনিয়াছিলাম। কিন্তু শিক্ষাদাতা অভাবে তাহার উদ্ধার সম্ভবপর হয় নাই।

বসিয়া কীর্ত্তন গান শুনিলেন। নৈশভোগের সময় নিকট জানিয়া কীর্ত্তন শেষ করা হইল। পূর্ব্বদিনের ন্যায় মুড়িগুঁড়া, আদা বাঁটা, চিনি ও দুধ দিয়া বাবার সেবা হইল। বাবা ভোজন শেষ করিয়া আসিয়া বিছানায় বসিলেন, চির অভ্যাস মত মধুর হাসি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"বেশ সেবা হচ্ছে রে, বাপু।" মেয়েরা ইতিপূর্ব্বে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা বাবার পায়ে তেল দিয়া পদ সেবায় নিযুক্ত হইল। আমি বাবার প্রসাদ-পাত্র লইয়া বাড়ী গেলাম। এই অলবণ মুড়ী গুঁড়া প্রসাদ আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল। সেইজন্য ইহার পরেও দীর্ঘকাল এই প্রণালীতে মুড়ী গুঁড়া ভোগ বাবার উদ্দেশে নিবেদন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতাম।

পরদিন সকালে বাবা আহ্নিক করিয়া বাহিরের চেয়ারে বসিলেন। আমরা সকলে প্রণাম করিলাম। পূর্ব্বদিনের ন্যায় রাসবিহারী দাদা বেদানার রস আনিয়া দিলে বাবা তাহা পান করিয়া ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। চিন্তামণি ও আরও দুই তিন জন যুবক বাবার সঙ্গে যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। বাবা তাহাদের সঙ্গে উত্তরমুখে নদীর ধারের দিকে বেড়াইতে গেলেন। আমরাও পূর্ব্বদিনের ন্যায় ভোগের আয়োজন করিতে লাগিলাম।

বাবা মানকচু ও ওল ভালবাসিতেন। আমাদের অঞ্চলে ভাল মানকচু হয় না বলিয়া উহা বৰ্দ্ধমান হইতে আনাইয়াছিলাম। কিন্তু আমার বাগানে ওল যথেষ্ট ছিল। আমি বাবার ভোগের সমস্ত আয়োজন করিয়া দিয়া একজন চাকরকে লইয়া ওল

খোঁড়াইতে লাগিলাম। প্রাচীরের ধারে ধারে ওল লাগান ছিল, কিন্তু ওল গাছগুলি মরিয়া যাওয়ায় এবং মাটী শক্ত হইয়া যাওয়ায় ওল বাহির করিতে বিলম্ব হইতেছিল। তথাপি দুই তিনটি মধ্যম আকারের ওল বাহির করিয়াছিলাম। এমন সময়ে বাবা বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু ঘরের ভিতর না গিয়া "কি হচ্ছে গো" বলিয়া আমার কাছে আসিলেন। আমি বলিলাম—"বাবা, ভোগের জন্য ওল খোঁড়াইতেছি, কিন্তু গাছ মরিয়া যাওয়ায় খুঁড়িতে কষ্ট হইতেছে।" নিকটে একটি গাছের ছায়ায় একটি বড় ওল গাছ ছিল, বাবা সেইটি দেখাইয়া বলিলেন—"উহার নীচে বড় ওল আছে, খোঁড়াও না কেন?" আমি বলিলাম—"বাবা, ওটা আওতার ওল, খাইলে গলা এবং মুখ কুট-কুট করিবে।" বাবা হাসিয়া বলিলেন,—"তোমরা উহার রান্না জান না। ওলটা বাহির কর, আমি রান্না শিখাইয়া দিব।" বাবার আদেশ মত ওল খুঁড়িয়া বাহির করা হইল। ওলটি অন্য ওল অপেক্ষা অনেক বড় ছিল। পরদিন বাবার নির্দ্দেশ মত প্রক্রিয়ায়* ওল সিদ্ধ করিয়া বাবার ভোগে দিলাম। আমরা প্রসাদ পাইবার সময় দেখিলাম ওল একটুকুও লাগে নাই।

---

* তিনি বলিয়াছিলেন—একটি হাঁড়িতে চারিটি ছোট ইটের টুকরা দিয়া তাহার উপর সাবধানে ওলটি বসাইতে হইবে, যেন ওলটি হাঁড়ি স্পর্শ না করে এবং দুই তিন আঙ্গুল উঁচু থাকে। একটি সরা দিয়া ঢাকিয়া শুষ্ক হাঁড়ি (জল না দিয়া) উনানের উপর বসাইতে হইবে। হাঁড়িটি পুড়িয়া লাল হইয়া যাইবে। এক ঘণ্টা পরে নামাইয়া দেখিবে ওলটি নিজ রসে সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তখন আর উহা কুট-কুট করিবে না।

শুন্নুড়ীর পাঁচ সাত মাইল পশ্চিমে বাগানবাড়ী নামক গ্রামে সীতারাম মিশ্র নামক একজন দেশবিখ্যাত ওস্তাদ বাস করেন। সঙ্গীত পরিষদ্ প্রদত্ত তাঁহার সম্মানজনক উপাধিও ছিল। তাঁহাকে জানিতাম, কিন্তু গুরুভাই বলিয়া জানিতাম না। মুনীন্দ্র দাদার সহিত তাঁহার খুব জানা-শুনা ছিল। মুনীন্দ্র দাদার পরামর্শ মত বাবার শুভাগমন সংবাদ জানাইয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানাইয়া পত্র লিখিলাম। পত্র পাইয়া পরদিন তিনি আসিয়া বাবাকে প্রণাম করিলেন। শুন্নুড়ীতে বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় নামক একজন বিখ্যাত পাখোয়াজবাদক ছিলেন। ইনি পূর্ব্ব কথিত ওস্তাদদ্বয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সীতারাম দাদা আসিয়াই তাঁহার সংবাদ লইলেন। কিন্তু তিনি কয়েকদিন পূর্ব্বে কোথায় গিয়াছেন, এখনও ফিরেন নাই। তখন তিনি খোলবাদক রাখাল দাশগুপ্তকে ডাকাইলেন এবং তাহাকেই যে সীতারাম দাদার গানে সঙ্গত করিতে হইবে তাহা জানাইয়া দিলেন। সীতারাম দাদা দুই তিন দিন থাকিয়া মনের সাধে বাবাকে গান শুনাইলেন। তিনি তানপুরা লইয়া গান গাইতেছিলেন, রাখাল পাখোয়াজে সঙ্গত করিতেছিলেন। ধ্রুপদাঙ্গ গানে মুনীন্দ্র দাদার কিছু কিছু অভিজ্ঞতা ছিল, তাঁহার উৎসাহেই এই যোগাযোগ হইয়াছিল। কাঁচা বাদক বলিয়া সীতারাম দাদা খুব সাবধানে গাহিতেছিলেন, মাঝে মাঝে তানপুরায় আঘাত করিয়া তাল দেখাইয়া দিতেছিলেন। তথাপি মাঝে মাঝে দোষ ঘটিতেছিল। বাবার কাছে অতি সূক্ষ্ম ত্রুটিও ধরা পড়িতেছিল। তিনি হাসিতে হাসিতে তাহা সংশোধন করিয়া দিতেছিলেন। আমি অবাক্ হইয়া

বাবার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। বাবা সুকণ্ঠ ছিলেন, যৌবনকালে তিনি গান গাহিতেন, আমি স্বকর্ণে বাবার গান না শুনিলেও তাঁহার গানের সুখ্যাতি অনেকের মুখে শুনিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি যে এত বড় সুনিপুণ পাখোয়াজী তাহা জানিতাম না। বাবা আমার মনের অবস্থা বুঝিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"আমি যে পাখোয়াজ বাজাইতে জানি, সেখানে (জ্ঞানগঞ্জে) ধ্রুপদের নানা তালে বেদগান হইত, আমি পাখোয়াজ বাজাইতাম।" মোটের উপর গান শুনিয়া সকলেই খুব খুসী হইল। কাঁচা বাদক জানিয়াই ত গান হইতেছিল, কিন্তু সীতারাম দাদার গান শুনার সৌভাগ্য সহজে ঘটিত না। বাবার কৃপায় তিন দিন ধরিয়া তাঁহার গান শুনিয়া আমাদের গ্রামবাসিগণ খুব আনন্দ লাভ করিয়াছিল।

এই স্থানটি বাবার ভাল লাগিয়াছিল, তিনি তিন চার দিন থাকিব বলিয়া আসিয়া বার দিন এখানে ছিলেন, আমিও মনের সাধে গ্রাম্য উপচার দিয়া বাবার পূজা করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু একটা দুঃখ আমার মনে সর্ব্বদা আঘাত করিতেছিল। আমার বাগানে অনেকগুলি ফলের গাছ ছিল, কিন্তু একটি ফলও বাবার ভোগে লাগাইতে পারি নাই। আমের গুটি হইয়াছে মাত্র, জামেরও ঐ অবস্থা, পেয়ারা শেষ হইয়া গিয়াছে। বেদানা অনেক ফলিয়াছিল, কিন্তু লোকের জ্বালায় (বিবাহ ও ঔষধের জন্য) একটাও রাখিতে পারি নাই। অন্তর্য্যামীর নিকট আমার এই মর্ম্ম-বেদনাও অবিদিত রহিল না। তিনি এক অলৌকিক উপায়ে আমার এই অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। একদিন বাবা বাগানে বেড়াইতেছিলেন, আমরা অনেকে বাবার

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছিলাম। বাবা বেড়াইতে বেড়াইতে একটি কুলগাছের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এটি কাশীর কুলের কলমের গাছ, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে কলম আনিয়া এইখানে পুতিয়াছিলাম, অদ্যাপি ফল ধরে নাই। বাবা এই কুলগাছের নিকট গিয়া হাত বাড়াইয়া একটি কুল ছিড়িয়া লইলেন। কুলটি বেশ বড় হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার রং সবুজ বর্ণ ই ছিল, পাকা ত দূরের কথা, ডাঁসা হইতেও কিছু বিলম্ব ছিল। বাবা কুলটির বোঁটা ফেলিয়া দিয়া কাপড়ে মুছিয়া মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন, এবং অল্পক্ষণ পরে মুখ হইতে আঠি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—"তোমার এই গাছের কুল বেশ সুস্বাদু হবে গো।"* আমি দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। অনেক অনুসন্ধান

---

* পর বৎসর শীতকালে ঐ গাছে অনেক কুল ফলিল। পৌষ মাসের শেষে—বাবা যে আকার ও বর্ণের কুল মুখে দিয়াছিলেন সেইরূপ আকার ও বর্ণ ধারণ করিতেই ইহার অপূর্ব্ব আস্বাদ প্রকাশ পাইলেন। পাড়ার ছেলেদের এই আস্বাদ জানিতে বিলম্ব হয় নাই। তাহারা চুরী করিয়া এই কুল খাইতে লাগিল এবং ইহার অপূর্ব্ব আস্বাদের কথা চারিদিকে প্রচার করিয়া দিল। কথা রাষ্ট্র হইলে অনেক লোক কুলের জন্য আমার নিকট আসিতে লাগিল। তখন আমার বাবার পূর্ব্ব বৎসরের কথা মনে পড়িল। আমি আর বিলম্ব না করিয়া কতকগুলি বড় বড় কাঁচা ফল পাড়াইয়া ঠাকুরদের ভোগ দিলাম, এবং প্রসাদ স্বরূপ ২।৪ টি কুল খাইলাম। আমি কাশীতে অনেক ডাঁসা ও পাকা কুল খাইয়াছি, কিন্তু এরূপ সুস্বাদু কুল কখনও খাই নাই। বাবার করস্পর্শেই কুলগাছটি এরূপ সুস্বাদু কুল ধারণ করিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমি প্রত্যহ কুল পাড়াইয়া পাড়ায় ও গ্রামে বিলি করিয়া দিলাম। এখনও প্রতি বৎসর ঐ গাছে কুল ধরে, কিন্তু ঠিক

করিয়াও গাছে আর কুল খুঁজিয়া পাইলাম না। চৈত্র মাসের প্রায় অর্দ্ধেক গত হইয়াছে, এ সময় কাঁচা কুল কোথা হইতে আসিল ? যদি অকালেই কুল ফলিয়া থাকে তবে ঐ একটির বেশী ফলিল না কেন ? কুলটি কিছু একদিন দুইদিনে এত বড় হয় না। মুকুল অবস্থা হইতে এই অবস্থায় আসিতে মাসাধিক কাল সময় লাগিয়াছিল, ছেলে-পিলে লোকজন সর্ব্বদা বাগানে ঘুরিতেছে, এই অকালের ফলটির উপর কাহারও দৃষ্টি পড়িল না কেন ? আমি অনেক ভাবিয়াও একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলাম না। আমার বিশ্বাস, বাবা আমার মনের প্রবল বাসনা পূরণের জন্য যোগবলে এই কুল সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

বাবা প্রত্যহই নদীর বা জোড়ের ধারে বেড়াইতে যাইতেন, এবং প্রস্তর কঙ্করময় অসমতল পথে চড়াই উতরাই ভাঙ্গিয়া তিন চার মাইল পথ হাঁটিতেন। দ্রুতগমনে আমরাও তাঁহার সঙ্গে চলিতে পারিতাম না। তিনি বেড়াইবার সময় নানা প্রকারের প্রস্তর খণ্ড সংগ্রহ করিয়া চিন্তামণির হাতে দিতেন, চিন্তামণি সেগুলি গামছায় বাঁধিয়া লইয়া আসিত, এবং একটা দেওয়াল-আলমারীর তাকে জমা করিত। জোড়ের স্থানে স্থানে নরম প্রস্তর-খণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িত, জলস্রোতে সেগুলি ধুইয়া ছোট বড় শালগ্রাম শিলার মত গোলাকার হইত। এইরূপ পাথর কয়েকটা

ঐরূপ অবস্থায় আসিলেই সুস্বাদু হয়। ঐ কাঁচা অবস্থায়ই বাবা আস্বাদনের সীমা রেখা টানিয়া দিয়াছিলেন। ঐ অবস্থা অতিক্রম করিলেই অধিকাংশ কুলে পোকা ধরিত এবং পাকিয়া গেলেও আস্বাদন আর বাড়িত না, বরং কমিয়া যাইত।

আলমারীতে তোলা ছিল। একদিন বাবা বেড়াইতে যাইবার পূর্ব্বে ঐরূপ একটা পাথর (আন্দাজ এক পোয়া) হাতে তুলিয়া লইয়া আমার নিকট এক টুকরা কাগজ চাহিলেন। আমি একটা পুরাতন খবরের কাগজ ছিঁড়িয়া তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি সেই কাগজ দিয়া পাথরটির চারিদিকে জড়াইয়া ঢাকিয়া ফেলিলেন। আমি বাবার দিকে চাহিয়াছিলাম। দেখিতে পাইলাম শুষ্ক প্রস্তরখণ্ড হইতে রস নির্গত হইয়া কাগজ ভিজিয়া আসিতেছে। আমি বিস্মিত হইয়া বাবার হাত হইতে পাথরটি লইতে গেলাম। বাবা তাড়াতাড়ি হাত সরাইয়া লইলেন। দুই মিনিট পরে বাবা মোড়কটি আমার হাতে দিলেন। আমি তাড়াতাড়ি খুলিয়া দেখি পাথরটি কোমল সুগন্ধযুক্ত টাট্‌কা বৈদ্যনাথের পেড়া হইয়া গিয়াছে। আমি বিমুগ্ধভাবে বাবার মুখের দিকে তাকাইলাম, বাবা আমাকে ঐটি উপস্থিত সকলকে একটু করিয়া দিতে আদেশ দিয়া বেড়াইতে চলিয়া গেলেন। আমি সকলকে একটু করিয়া হাতে হাতে দিতে লাগিলাম, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে এত লোক জমিয়া গেল যে আমি দুই আঙ্গুলি দ্বারা এক চিমটি করিয়া দিয়াও কুলাইতে পারিলাম না।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার ৺পিতৃদেব ও ৺খুড়ামহাশয়ের দীক্ষার কয়েক বৎসর পরেই আমাদের কুলগুরু অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন। অদ্যাপি আমার খুড়ীমার দীক্ষা হয় নাই। তিনি আমা অপেক্ষা দেড় বৎসরের ছোট। বাবার আগমন সংবাদ পাইয়া তিনি নুনী হইতে গুন্‌সুড়ীর বাড়ীতে আসিলেন, এবং বাবার নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করিলে বাবা অনুমতি দিলেন। আমি

দীক্ষার সমস্ত আয়োজন করিয়া দিলাম, যথা সময়ে আমার খুড়ীমাতা শ্রীমতী জগদম্বা দেবীর দীক্ষা হইয়া গেল। চিন্তামণির দীক্ষার কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। এখানে আর একজনের দীক্ষা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার নাম মনে নাই। ইনি মুনীন্দ্র দাদার স্বজাতি ও আত্মীয়, বাড়ী অণ্ডালের নিকটবর্ত্তী ডুবচুড়ুনিয়া গ্রামে। ইনি ইতিপূর্ব্বে বাবার নিকট দীক্ষার অনুমতি পাইয়াছিলেন। বাবা এখানে আসার পর মুনীন্দ্র দাদা বাবার অনুমতি লইয়া তাঁহাকে এখানে আসিতে পত্র লিখিলেন। তিনি আসিলে তাঁহারও দীক্ষা হইয়া গেল। আমি বাবার সঙ্গে বর্দ্ধমান গিয়া বীরেন দাদার খাতায় সকলের নাম তালিকাভুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম।

আমি জন্মোৎসবের সময় সমাগত গুরুভ্রাতাদের অনেককেই বাবার অনুগমন করিয়া আমার বাড়ী যাইবার আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলাম। বাবা নিজে কাহাকে কাহাকেও তাঁহার ধারা মত "যাইবার চেষ্টা করিবে" বলিয়া আমার আমন্ত্রণের পোষকতা করিয়াছিলেন। এইজন্য প্রত্যহ তাঁহাদের প্রতীক্ষা করিতে হইত। এবার কলিকাতায় গুরুভাইদের অনেকের মুখে কুমারডুবীর বড় পান্তোয়ার প্রশংসা শুনিয়াছিলাম। তজ্জন্য আমি অনাথ চক্রবর্ত্তী দাদাকে কিছু পান্তোয়ার বরাত দিয়াছিলাম। বাবার আগমনের পর দুই তিন দিন মধ্যে অনাথ দাদা এক হাঁড়ি পান্তোয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। বরাকরের ষ্টেশন মাষ্টার জগদীশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় দাদাও ঐ সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা রাত্রের ট্রেণে আসিয়া বাবাকে প্রণাম করিয়া পরদিন দিনের ট্রেণে

ফিরিয়া গিয়াছিলেন। বাবার কৃপায় আমার মোটামুটি কোন দ্রব্যের অভাব ছিল না। চাষের চাউল, ডাইল, বাগানের তরকারী, পুকুরের মাছ সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিল। আমার বাড়ীতে ঘোড়া ছিল, আমি যে কোন সময়ে আট মাইল দূরবর্ত্তী আসানসোল ও চার মাইল দূরবর্ত্তী বার্ণপুরের বাজার হইতে এক দেড় ঘণ্টা মধ্যে যে কোন দ্রব্য আনাইয়া লইতে পারিতাম। সকলের উপর সর্ব্বভয়হারী বাবা আমার বাড়ীতে রহিয়াছেন, আমাকে অপদস্থ হইতে দেখিলে তিনি কখনই স্থির থাকিতে পারিবেন না, এই ভাবিয়া আমি সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত থাকিতাম। অভ্যাগতগণের আগমনমাত্র প্রথম সম্ভাষণে জলযোগের জন্য কিছু বুঁদিয়া সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখিতাম। কারণ আমার গুরুভ্রাতারা শুভাগমন না করিলেও বাবার দর্শনার্থী আত্মীয়দের সমাগমের অভাব ছিল না। তাঁহারা দুই একদিন বাবার সঙ্গ করিয়া চলিয়া যাইতেন, কেহ বা দীর্ঘদিনও থাকিতেন। নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী অনাত্মীয় ভদ্রলোকও বাবাকে দেখিতে আসিতেন, বেলা হইয়া গেলে তাঁহাদিগকে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য অনুরোধ করা হইত, আরও এক বেলা বাবার সঙ্গ-সুখের লোভে তাঁহারা অনেকে আমার এই অনুরোধ রক্ষা করিতেন। এইভাবে প্রত্যহ দশ পনর জন অভ্যাগতের ভোজনের ব্যবস্থা করিতে হইত।

এই বাগানবাড়ীটি বাবার জন্য নূতন নির্ম্মিত হইয়াছিল। নূতন গৃহে কিছু দৈবকর্ম্ম করার বিধি আছে। বাবার শুভাগমনে তাঁহার পূত পদধূলিস্পর্শে ঘরটি সুপবিত্র হইয়া গিয়াছিল। তথাপি কিছু খাওয়ান দাওয়ান আবশ্যক বোধে একদিন কিছু

কুমারী ভোজনের আয়োজন করিলাম। ত্রিশ চল্লিশ জন কুমারীকে লুচি মিষ্টান্নাদির দ্বারা পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান হইল এবং প্রত্যেককে সিকি দক্ষিণা দেওয়া হইল। বাবা দেখিয়া খুসী হইলেন।

১৬ই চৈত্র সন্ধ্যার পর, বাবা পরদিন বর্দ্ধমান যাইবার প্রস্তাব করিলেন। আমার বলিবার কিছুই ছিল না। বাবা তিন চার দিন থাকিবেন কথা ছিল, কিন্তু কৃপা করিয়া বারদিন থাকিয়া গেলেন। এইভাবে বাবার সেবা করিবার সৌভাগ্য আর ঘটিবে কিনা ভাবিয়া করযোড়ে তাঁহাকে আরও দিন কতক থাকিবার জন্য প্রার্থনা করিলাম। বাবা বলিলেন, "আরও দিন কতক থাকিয়া যাইতাম, কিন্তু আগামী পরশ্ব ১৮ই চৈত্র পূর্ণিমা পড়িবে, ঐদিন কিছু কুমারী ভোজন করাইতে হইবে।" আর ত কোন কথা নাই, আমি অধোমুখে চুপ করিয়া রহিলাম। আমার মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন—"আসার জন্য ভাবনা কিরে বাপু! তোমার এই ঘরটা দোতালা * হইলে আবার আসা যাইবে।"

---

* বাবা একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন :—"ঘরটি আর একটুকু বড় হইলে ভাল হইত।" আমি তদুত্তরে বলিলাম,—"যাহা হইবার হইয়াছে। ইহার পর দোতালা করার সময় উপরে দুইটি কুঠরী না করিয়া একটি মাত্র বড় ঘর ও একটি ছোট বারাণ্ডা করিব।" তাই বাবা বলিয়াছিলেন—"ঘরটি দোতালা হইলে আবার আসা যাইবে।" ইহার পর বৎসর হইতে আমার খুব অর্থকষ্ট হইয়াছিল, তজ্জন্য আর দোতালা করিতে পারি নাই। বাবা একথা ভুলিয়া যান নাই। বোধ হয় ইহার দশ বৎসর পরে কাশীতে জন্মোৎসবের সময় বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিরে বাপু, বাগান

সন্ধ্যার পর বাবা আহ্নিক করিয়া উঠিলে বাড়ীর মেয়েছেলেরা আসিয়া যথাসাধ্য কিছু প্রণামী দিয়া বাবাকে প্রণাম করিল। বাবার শুভাগমনের দিন হরিশ কর্ম্মস্থলে ছিল, কয়েক দিন পরে আসিয়া বাবাকে প্রণাম করিয়াছিল, অন্তও আসিয়া প্রণাম করিল। আমার বড় ছেলে নলিন বাবাকে প্রণাম করিয়া করযোড়ে বলিল, "বাবা, আপনার শুভাগমন উদ্দেশে এই গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং আপনার পদস্পর্শে ইহা পবিত্র হইয়াছে। ইহার একটা কিছু নাম হওয়া উচিত।" অনেক আলোচনার পর ইহার নাম "বিশুদ্ধানন্দ উদ্যান"* রাখা হইল।

ভোরে উঠিয়া তাড়াতাড়ি গেলাম, বাগানে গিয়া দেখি ভোলানাথ আরও আগে আসিয়া চুলায় আঁচ দিয়াছে। বেলা ১১ টার সময় ট্রেণ, নয়টার সময় বাবার ভোগ হওয়া চাই, দশটার মধ্যে আমাদিগকে প্রসাদ পাইয়া প্রস্তুত হইতে হইবে। পূর্ব্বদিন হইতে সমস্ত আয়োজন করা ছিল, নয়টার মধ্যে বাবার ভোগ হইয়া গেল। আমরা দশটার মধ্যে প্রসাদ পাইয়া প্রস্তুত হইয়াছিলাম। আমি বাবার সঙ্গে যাইব স্থির হইয়াছিল। বাহকগণ নয়টার আগে আসিয়া পাল্‌কী বাহির করিয়া আনিয়া

ঘরটা দোতালা হলো ?" আমি দুঃখের সহিত জানাইলাম, "বাবা, অর্থাভাবে আজ পর্য্যন্ত দোতালা করিতে পারি নাই।" বাবা হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"যা বেটা, তা হলে আর তোর বাড়ী যাওয়া হলো না।" বাবা এই ভাবে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি ফিরাইয়া লইয়াছিলেন।

* ইহার কয়েক মাসে পরে আমি একটি মার্ব্বেল পাথরের উপর "বিশুদ্ধানন্দ উদ্যান" লিখাইয়া ফটকের একপার্শ্বে লাগাইয়া দিয়াছিলাম।

সাজাইয়া লইল। বাবার আগমনের পরদিন মিস্ত্রী ডাকাইয়া পাল্‌কীটি ঠিক করাইয়া রাখিয়াছিলাম; তথাপি বাহকেরা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইল, পূর্ব্বদিনের ন্যায় ঠকিতে না হয়। আগমনের দিনের ন্যায় সমস্ত মাঙ্গলিকের আয়োজন করা হইয়াছিল। বাবা বাহির হইয়া পাল্কীতে উঠিলেন, রাসবিহারী দাদা বাবার ব্যাগ আনিয়া পাল্কীতে রাখিয়া দিল। বাবার পাল্কী উঠিল, আমার অন্তর হুহু করিয়া উঠিল, কিছুতেই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আজ ত্রিশ বৎসর পরে লিখিবার সময় সেই দিনের দৃশ্য মানস নেত্রে ভাসিয়া উঠায় লেখনী ফেলিয়া কিছুক্ষণ কাঁদিয়া লইলাম। সেদিন বাবার ভয়ে ভাল করিয়া কাঁদিতে পারি নাই, আজ অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া লইলাম। সেদিন আশা ছিল, বাবা আবার আসিবেন, আবার এখানে আনন্দের হাট বসিবে। কিন্তু আজকে কোন আশাই নাই। কান্নার দোষ কি? বাবা আমাকে দেখিয়া বলিলেন—"কাঁদ কেন?—আমি আবার আসিব।" আসিবেন কি?

আমি কাঁদিতে কাঁদিতে পাল্কীর অনুগমন করিলাম। মেয়েরা পূর্ব্বদিনের ন্যায় পূর্ণঘট দেখাইল। আজ কিন্তু সবই বিপরীত, সেদিন তাহাদের মন ছিল আনন্দে ভরা, কিন্তু আজ হাসিমুখ বিষাদময়, চক্ষু অশ্রুভারাবনত। পাল্কী ফটকের বাহির হইল, রাস্তার দুই পাশে লোক দাঁড়াইয়াছিল, সকলেই করযোড়ে প্রণাম করিয়া বিদায় সম্ভাষণ জানাইল। পাড়ার মেয়েরা বাবাকে দেখিবার জন্য আপন আপন দরজায় দাঁড়াইয়াছিল। বাবার পাল্কী সম্মুখে আসিলে সকলেই বাবাকে প্রণাম করিল। সকলের মুখেই বিষাদের

ছায়া পড়িয়াছে। পড়িবারই কথা—বাবার আসার দিন হইতে গ্রামের মধ্যে একটা আনন্দের স্রোত বহিতেছিল, আজি সেই স্রোতের উৎস শুখাইয়া গেল, বাবা শুন্থুড়ী ছাড়িয়া চলিলেন। দেখিতে দেখিতে বাবার পাল্কী ষ্টেশনে গিয়া পঁহুচিল। তখনও ট্রেণ আসার বিলম্ব ছিল; যেখানে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী দাঁড়ায় সেইখানে পাল্কী নামান হইল, বাবা পাল্কীতেই বসিয়া রহিলেন। ট্রেণ আসিলে বাবা একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিলেন, আমি বাবার ব্যাগ হাতে লইয়া ঐ গাড়ীতে উঠিলাম। ট্রেণ মুরুলিয়া ষ্টেশনে বেশীক্ষণ থামে না বলিয়া যে যেখানে পারিল উঠিয়া পড়িল। আমার বড় ছেলে ও আরও কয়জন ষ্টেশন পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিল। তাহারা ট্রেণে উঠিয়া একে একে বাবাকে প্রণাম করিয়া নামিয়া গেল। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

আসানসোলে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হয়, বাবা নামিয়া বিশ্রাম ঘরে বসিলেন। অল্পক্ষণ পরেই বর্দ্ধমান যাইবার গাড়ী আসিলে বাবা গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। আমি বাবার গাড়ীতে উঠিলাম। মুনীন্দ্র দাদা, রাসবিহারী দাদা ও ভোলানাথ অন্য গাড়ীতে উঠিল। আমরা বিকাল ২॥ টার সময় বর্দ্ধমানে পঁহুচিলাম। ছুর্গাদাদা, শিবুদাদা প্রভৃতি আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। আমরা গিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলাম, বাবা উপরে চলিয়া গেলেন। ছুর্গাদাদা শুন্থুড়ী গিয়াছিলেন। তিনি মুনীন্দ্র দাদা ও রাসবিহারী দাদাকে নানাস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ও জোড়ের কথা আলোচনা করিয়া খুব আনন্দ উপভোগ করিলেন। সন্ধ্যার পর বাবা নীচে আসিয়া কিছুক্ষণ বসিয়াছিলেন, সহর হইতে

কয়েকজন শিষ্য বাবাকে প্রণাম করিতে আসিলে বাবা তাঁহাদের নিকট শুনুড়ীর জলবায়ু, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও বাগানের গল্প করিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন।

পরদিন ১৮ই চৈত্র আশ্রমে কুমারী ভোজন হইল। আমি সানন্দে কুমারীর প্রসাদ ও বাবার প্রসাদ গ্রহণ করিলাম। বিকালে বাবার অনুমতি লইয়া বাড়ী ফিরিলাম।

"অদ্যাপিও সেই লীলা"

সম্পাদক

(১)

মহাপুরুষগণের অন্তর্দ্ধান কি মৃত্যু ? যোগী যে মৃত্যুঞ্জয়। শ্রীশ্রীবাবা বিশুদ্ধানন্দ অন্তর্দ্ধানের পরে নানাস্থানে নানারূপ কৃপালীলা করিতেছেন। ইহার দুই চারিটি বিবরণ ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতেছে। অনেক ঘটনা যে অপ্রকাশিতই থাকিয়া যাইতেছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

একটি অত্যন্ত অসাধারণ রকমের লীলা শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত প্রণীত "যোগিরাজাধিরাজ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস" গ্রন্থে (পৃঃ ৭৩৫-৩৬) বর্ণিত হইয়াছে। কৃপাপ্রাপ্ত ভদ্রলোকটির নাম বৈদ্যবাবু হরিলাল ভোগিলাল ত্রিবেদী, নিবাস বালসিনোর, গুজরাট। ইনি বাবাকে চর্ম্ম চক্ষে দেখেন নাই। সম্প্রতি ইহারই মুখে বাবার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া আর একটি গুজরাটী ভদ্রলোক যে-ভাবে তাহার উপলব্ধি করিয়াছেন নিম্নে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

ভদ্রলোকটির নাম রঘুনাথজী নাগরজী নায়ক। থাকেন বোম্বাই শহরে। ইনি গত ২৪শে জানুয়ারী (১৯৫৪) তারিখে কলিকাতার অক্ষয় (দত্তগুপ্ত) দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন যে, তিনি পূর্ব্বোক্ত বৈদ্যবাবু হরিলাল ত্রিবেদীজীর মুখে বাবার কথা শুনিয়া তাঁহার জন্মভূমি বণ্ডুল দর্শনে জন্য উৎসুক হইয়াছেন,

অক্ষয় দাদা এই বিষয়ে তাঁহার সাহায্য করিলে তিনি অত্যন্ত উপকৃত হইবেন। অক্ষয় দাদা তাঁহাকে শ্রীশ্রীবাবার ভ্রাতুষ্পুত্র শিবু দাদা ও পৌত্র সরোজমোহন বাবার যুক্ত নামে একখানি পত্র দিয়া বলেন, উঁহাদের যে কেহ বৰ্দ্ধমান আশ্রমে থাকিলে তাঁহাকে উপযুক্তরূপ সাহায্য করিবেন। চিঠিতে ঠিকানা দেওয়া হইয়াছিল—বিশুদ্ধাশ্রম, বৰ্দ্ধমান। পল্লীর নাম জানা নাই বলিয়া তাহার উল্লেখ ছিল না। রঘুনাথজী বৈদ্যনাথধাম হইয়া বৰ্দ্ধমান যান। ট্রেণ রাত্রি তিনটায় বৰ্দ্ধমানে পৌঁছিবার কথা। নিতান্ত অপরিচিত স্থান, বড় অসময়। কিন্তু ট্রেণ যেন বাবার ইচ্ছায়ই পথে দেরী করিয়া ভোর ছয়টায় পৌঁছিল। ষ্টেশনে বহু রিক্সওয়ালা ছিল, কিন্তু তাহাদের কেহই বিশুদ্ধাশ্রম চিনে না—সরোজ চট্টোপাধ্যায়ের নামও শুনে নাই। ভদ্রলোক বিপন্ন হইয়া ষ্টেশনেই "ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং" ইত্যাদি শ্লোকটি মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। এমন সময় তাঁহার পরম বিস্ময় উৎপাদন করিয়া ধুতি, কৌপীন, গাত্রাবরণ ও লোটাধারী একটি লোক হঠাৎ তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলে তিনি সসম্ভ্রমে বলিলেন, "জয় গুরু"। লোকটি বলিল, "তুমি বিশুদ্ধাশ্রম যাবে? আমার সঙ্গে এস।" এই বলিয়া সে তাঁহাকে ষ্টেশনের বাহিরে আনিয়া একটা পথ দেখাইয়া বলিল, "এই পথে কতক দূর গেলে আর একটি লোকের সাক্ষাৎ পাইবে; সে তোমাকে আশ্রম দেখাইয়া দিবে।" এই কথা বলিয়া লোকটি বিপরীত দিকে চলিয়া গেল। রঘুনাথ জী অক্ষয় দাদাকে লিখিয়াছেন, "আমি বিস্মিত হইয়া ঐ লোকটির দিকে তাকাইয়া ভাবিলাম, ইনি কি বাবাই হইবেন?

নচেৎ এ দয়াময় কে? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে দেখি সে লোকটি আর নাই। যাহা হউক, আমি তাঁহার প্রদর্শিত পথে কতক দূর গিয়া সত্য সত্যই আর একটি লোকের সাক্ষাৎ পাইলাম এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে আমাকে একটি বাড়ী দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।"

ইহার পরে তিনি আশ্রমে ঢুকিয়া শিবু দাদা ও বাবার তিন পৌত্রকেই পান। তাঁহারা পরিচয় পত্রে তাঁহার উদ্দেশ্য অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত আদর প্রদর্শন করেন এবং তাঁহাকে চা পান করাইয়া একটি ট্যাক্সি ঠিক করিয়া দেন, এবং বাবার এক পৌত্র তাঁহার সঙ্গেই বণ্ডুল যান। সেখানে রঘুনাথ জী নায়ক বাবার জন্মস্থান, সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, বণ্ডুলেশ্বর শিব ইত্যাদি দর্শন করেন। বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বণ্ডুলেশ্বরের বর্ণ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া ইনি অত্যন্ত বিস্মিত হন। তিনি লিখিয়াছেন, "It is the most wonderful শিবলিঙ্গ of all ages. How can I describe the joy I felt !"

বোম্বাইতে ফিরিয়া গিয়াও তিনি বহুবার শ্রীশ্রীবাবার গাত্রগন্ধ পাইয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন। "Several times have I felt his presence by his all-pervading wonderful smell."

ক্রমশঃ

শেষ প্রার্থনা

রায় সাহেব শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, কবিরত্ন, এম-এ

তিমিরে-আবৃত নেত্র, দুর্গম সরণি,
কোন্ দিকে চলেছিনু ঠিক নাহি জানি।
কণ্টকে চরণ ক্ষত, হস্ত যষ্টিহীন,
যুগ যুগ চলি' চলি' আর্ত্ত, ক্লান্ত, ক্ষীণ।
বিপুল করম ভার পিঠের উপরে,
মনে নাহি বল, নাহি শান্তি ক্ষণতরে।
কে বলিবে এইভাবে আরো কত কাল
চলিতে হইত যদি তুমি, হে দয়াল,
না চাহিতে নিজ হ'তে করুণ নয়নে
অধমের দিকে, যদি নাহি নিতে টেনে
চরণের কাছে তব, না দিতে শিখায়ে
কর্ম্ম কাটিবার পন্থা, না দিতে ঘুচায়ে
আখির তিমিরপুঞ্জ। তোমার করুণা
পাপী ব'লে কোন দিন করে নাই ঘৃণা।
মনে পড়ে সেই দীপ্ত আয়ত নয়ন,
স্মিতমুখে মধুবর্ষী সেই সম্ভাষণ।
দিয়েছ অভয়বাণী—"চিন্তা কেন, ওরে,
কর্ম্ম কর, আর ভার দেও মোর 'পরে।

নিত্য সাথে সাথে থাকি জানিও নিশ্চয়,
কর্ম্ম কর, আমি আছি নাহি কোন ভয়।"
কাছে কাছে থাকিতে যে দিতে তা বুঝায়ে
ছেঁদো কথা দিয়ে নয়, গাত্রগন্ধ দিয়ে।
"গুরুভক্তি বড় কথা", বলেছ সকলে,
"ভক্তি থা'ক্, ভালবাস শুধু বাপ ব'লে।"
এমন দয়ার নিধি, হেন স্নেহবান্,
এত শক্তি সাথে এত কোমল পরাণ,
কে দেখেছে কোন্ কালে? কোথা পাব আর
হে পিতঃ, হে কৃপাসিন্ধু, তুলনা তোমার?
জ্ঞান নাই, ভক্তি নাই, নাই ক্রিয়া বল,
তোমার চরণ, নাথ, সম্বল কেবল।
ফুরায়ে এসেছে দিন, ফুরায়েছে পথ,
খেয়াঘাট দেখা যায়; এই মনোরথ
স্থান দিও শ্রীচরণে—নিজ হাতে ধরি'
তুলিও তরণী'পরে, নিয়ো নিজ পুরী।

৩রা ফাল্গুন ১৩৬।

শ্রীশ্রীমদ্ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব বিষয়ক প্রকাশিত
পুস্তকাবলী

১। শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ (৫ খণ্ড)—
শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ প্রণীত।

প্রথম ভাগ—চরিত কথা—১ (অনুপলভ্য)
দ্বিতীয় ভাগ—তত্ত্ব কথা—১
তৃতীয় ভাগ—লীলা কথা
পূর্বার্দ্ধ—১
উত্তরার্দ্ধ—১-২

২। যোগিরাজাধিরাজ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস—
শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত প্রণীত।

৩। শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস রচিত গীতরত্নাবলী—
শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ সম্পাদিত।

প্রাপ্তিস্থান—
কার্য্যকারক
"বিশুদ্ধানন্দ কানন"-আশ্রম
মালদহিয়া, বেনারস।